বনের বাতাস

প্রফুল্ল রায়

১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

শচীন দাস

স্নেহাস্পদেষু

বম্বে সিটি থেকে কুড়ি মাইল দূরে জুহু-তারা রোডের এই বিশাল মালটি-স্টোরিড বাড়িটার নাম 'আইল্যাণ্ড'। এরই বারো তলার একটা ফ্ল্যাটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে আরামদায়ক নরম কুশনের ওপর বসে ছিল জয়া।

মাটি থেকে প্রায় দেড় শো ফুট উচ্চতায় জয়া যেখানে বসে আছে সেখান ডাইনে নিচের দিকে তাকালে কালো ফিতের মতো অ্যাসফল্টের ঝকঝকে মসৃণ রাস্তা। রাস্তাটার এপারে বা ওপারে, চারদিকে বিরাট বিরাট অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস। আর আছে ফরেন কোলাবরেশনে তৈরি প্রকাণ্ড ফ্যাশনেবল হোটেল। বছরের বারো মাসই হোটেলগুলোতে বিদেশী টুরিস্ট, বিশেষ করে ইজিপ্ট ডুবাই কি কুয়েতের জোব্বাজুব্বি পরা কোটিপতি আরবরা ভিড় করে থাকে। সামনের দিকে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসগুলোর ফাঁক দিয়ে জুহু ফ্লাইং ক্লাবের উঁচু টাওরটা আকাশে মাথা তুলে দিয়েছে।

আইল্যাণ্ডে'র পেছন দিকে অগুনতি নারকেল গাছ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। নারকেল গাছের ঘেরের পর থেকে জুহু বীচ শুরু হয়েছে। বাদামী বালির এই বেলাভূমি যেখানে শেষ হয়েছে তার বর্ডার থেকে যতদূর চোখ যায়— আরব সাগর। একখানা ঝক্‌মকে নীল আয়নার মতো সমুদ্র দিগন্তের ফ্রেমে আটকে আছে যেন।

এখন দুপুর। সময়টাও ডিসেম্বরের শেষাশেষি অর্থাৎ শীতকাল। কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে বম্বে শহরে তেমন একটা ঠাণ্ডা পড়ে না। আবহাওয়া অনেকটা বাংলা দেশের ফাল্গুন মাসের মতো। না শীত, না গরম।

এখন, এই দুপুর বেলাতেই জুহু বীচে লোকের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কেউ কেউ সমুদ্রে নেমেও পড়েছে; তারপর ঢেউয়ের টানে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে। বীচ থেকে তাদের কালো কালো ফুটকির মতো দেখায়।

কিছুক্ষণ ধরে সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছে। ফলে বীচের নারকেল বনে ঘোড়া ছোটাবার মতো একটানা সাঁই সাঁই শব্দ হয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পনের মিনিট পর পর আরও একটা শব্দ কানে আসছে। জুহুর পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট। সেখানে থেকে ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের ওয়েস্ট-বাউণ্ড প্লেনগুলো বিরাট বিরাট বাজ-পাখির মতো বাতাস চিরে চিরে কোনাকুনি আরব সাগর পার হয়ে চলে যাচ্ছে।

জুহু বীচের লোকজন, দূরে গভীর নীল সমুদ্র, বাতাসের শব্দ, চারদিকের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস, ফ্লাইং ক্লাবের টাওয়ার, প্লেনের আওয়াজ—কোন দিকেই কিন্তু লক্ষ্য নেই জয়ার। ড্রেসিং টেবিলের ডিমের মতো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে ধবধবে ফরসা কপালে গোলাপী রঙের বিন্দির টিপ আঁকছিল সে।

জয়ার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু ঠিক অতটা দেখায় না। গায়ের রং এই বয়সেও আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। ঈষৎ লম্বাটে মুখ। ভরাট গাল দু দিক থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে সরু চিবুকের দিকে নেমে এসেছে। চোখ খুব একটা বড় নয় জয়ার, তবে তাতে লম্বা টান রয়েছে। মণি দুটো কুচকুচে কালো। পাখির মেলে-দেওয়া ডানার মতো ভুরু। গোল মসৃণ গলা। এই বয়সেও কণ্ঠা বা কাঁধের হাড় ফুটে বেরোয় নি, কোমল মাংসে সব কিছু ঢাকা। প্রচুর চুল তার মাথায়। 'মড' মেয়েদের মতো সেগুলো ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে ফেলে নি সে।

আজ দুর্দান্ত সেজেছে জয়া। মেরুন রঙের দামী সিফনের শাড়ি পরেছে এবং ঐ রঙেরই ব্লাউজ। গলায় পরেছে মুক্তোর একটা হার, ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে মুক্তোর আংটি, কানে মুক্তোর কানফুল। বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে ফুলের কুঁড়ির মতো ছোট্ট গোল ঘড়ি।

চড়া রঙ-চঙ বা উগ্র ধরনের সাজপোশাক একেবারেই পছন্দ করে না জয়া। সে অত্যন্ত শান্ত মৃদু স্বভাবের মেয়ে। তার সাজসজ্জার সবসময় একটা স্নিগ্ধ রুচির ছাপ থাকে। কিন্তু আজ সে শুধু মেরুন রঙের শাড়িই পরে নি ; ঠোঁটে নখেও গাঢ় রঙ লাগিয়াছে, পোশাকে দামী পারফিউম ঢেলেছে অনেকটা। এমন কি সকালে ভিলে পার্লের দিকে গিয়ে চীনা হেয়ার ড্রেসারকে দিয়ে নকশা করে চুলও বাঁধিয়ে এনেছে। এ-সব সে করেছে অজয়ের জন্য। অজয়

জমকালো সাজ এবং রঙচঙ খুব পছন্দ করে। কিন্তু অজয়ের কথা এখন না, পরে।

জয়া মাঝারি ধরনের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে মোটামুটি একটা ভালো চাকরিই করে। নিজের হাতে সাজবে বলে আজ সে অফিসে যায় নি। তা ছাড়া বিকেলে অজয়ের সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। যেখানে তারা যাবে সেখানে শান্ত পবিত্র মন নিয়েই যাওয়া উচিত। অফিসে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে সারাদিন চেঁচামেচি করে রাজ্যের ক্লান্তি আর উত্তেজনা নিয়ে সেখানে যাওয়া ঠিক না।

কপালের মাঝখানে টিপটা নিখুঁত করে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। বিন্দির লম্বাটে কৌটোটা ড্রেসিং টেবলের একধারে রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জয়া। তারপর ঘুরে ফিরে প্রকাণ্ড আয়নায় নিজেকে অনেক বার করে দেখল। নাঃ, কোথাও কোন খুঁত নেই। শুধু ক'টা চুল সিঁথির দুধার থেকে কপালের ওপর উড়ে এসেছিল। সরু দাঁতের চিরুনি দিয়ে সেগুলো সরিয়ে দিতে দিতে জয়া অনুভব করল তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে। এখনই নাঃ, আজ ভোরবেলা ঘুমভাঙার পর থেকেই কাঁপুনিটা শুরু হয়েছিল। আর এই কাঁপুনি নিয়েই চীনাদের বিউটি পারলার থেকে সে চুল বাঁধিয়ে এনেছে, স্নান করেছে, গ্যাসের উনুনে যা হোক কিছু রান্না করে নিজে খেয়েছে, বাবাকে খাইয়েছে। তারপর নিজের হাতে নিজেকে সাজিয়েছে। অথচ জয়ার যা বয়স এবং জীবনে যা সব ঘটনা বা দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে তার তিরিশটা বছর কেটেছে তাতে এই কাঁপুনি মানায় না। কি ভাবে সে এতগুলো বছর কাটিয়ে এল সে কথা পরে।

শুধু এবারই না, গত দু বছরে আজ নিয়ে মোট তিনবার এভাবে সেজেছে জয়া। আর যতবার সেজেছে ততবারই বুকের ভেতর যেন ঝড় ভেঙে পড়েছে।

উড়ন্ত চুলগুলো পরিপাটি করে সিঁথির দু ধারে সরিয়ে দিয়ে চিরুনিটা ব্রাশে আটকে রাখল জয়া। তারপর কবজি উল্টে ঘড়িটা একবার দেখে নিল। এখন একটা বেজে পঁচিশ। ঠিক তিনটেয় চার্চগেট স্টেশনের বাইরে ওভার-ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে অজয়। তার মানে হাতে এখন দেড় ঘণ্টার মতো সময় রয়েছে। খুবই অল্প সময়। চার্চগেট এখান থেকে কম দূর তো

নয় ; কুড়ি মাইলেরও বেশী হবে। তিনটের ভেতর পৌঁছুতে হলে আর দেরি করা যায় না।

জয়া তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সামনেই প্যাসেজ। প্যাসেজের এ পাশে জয়ার ঘরের পর আরো দুটো ঘর একটা তার বাবা শিবনাথের, অন্যটা হল লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম। একেবারে শেষ মাথায় কিচেন, স্টোর, বাথরুম ইত্যাদি। অবশ্য প্রতিটি ঘরের গায়েও অ্যাটাচড বাথ রয়েছে।

বারো শো স্কোয়ার ফুটের মোজেক-করা টাইলস-বসানো এই ছিমছাম ফ্ল্যাটে মাত্র তিনজন মানুষ থাকে—জয়া, তার বাবা এবং তাদের কাজের লোক এক মধ্যবয়সী বিধবা মারাঠী মেয়েমানুষ। তার নাম তারা।

তারা আজ বাড়িতে নেই। দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে কাল বিকেলে ঘাটকোপারে সে তার এক ভাইয়ের বাড়ি গেছে। ফিরতে ফিরতে পরশু।

তারা না থাকাতে একরকম ভালোই হয়েছে। হঠাৎ এত সেজেগুজে জয়াকে বেরুতে দেখলে প্রথমটা অবাক হয়ে যেত তারা, তারপর হৈ-চৈ বাধিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলত। সব ব্যাপারেই তার বড় বেশী কৌতূহল। অথচ অজয়ের সঙ্গে আজ জয়া যেখানে যাচ্ছে সেটা আপাতত সে গোপনই রাখতে চায়। তার ইচ্ছা নয়, একেবারে গোড়াতেই সব জানাজানি হয়ে যাক। পরে সময় মতো সবাইকে সে নিজেই জানিয়ে দেবে।

অবশ্য শিবনাথ আজ বাড়িতেই আছেন। জয়ার এত সাজটাজ চোখে পড়লে তিনিও নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবেন ; এর আগেও দু'বার হয়েছেন। জন্মের পর থেকে তিরিশটা বছর বাবার ছায়ায় ছায়ায় কেটে গেল জয়ার। মুখের দিকে একপলক তাকালেই শিবনাথ তার মনের কথা ধরে ফেলতে পারেন। তার চলাফেরা, তাকানো কিংবা সাজপোশাকে এতটুকু হেরফের দেখলেই বুঝতে পারেন নতুন কিছু ঘটছে। তবে যত অবাকই হোন, শিবনাথ কখনও কোন প্রশ্ন করেন না। কোন বিষয়েই তাঁর বিশেষ কৌতূহল নেই, থাকলেও প্রকাশ করেন না। করলে কোন কোন সময় খুবই অস্বস্তিতে পড়তে হত জয়াকে।

বাবার মতো আরও একজন তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়েই মনের কথা বুঝে ফেলতে পারেন ; তিনি সাধনা মাসী। কিন্তু সাধনার কথা এখন নয়।

প্যাসেজ ধরে ক'পা এগুতেই ভায়োলিনের সুর শুনতে পেল জয়া। কোমল নিখাদে সুরটা বেজে যাচ্ছে। আরেকটু যেতেই চোখে পড়ল শিবনাথের ঘরের দরজাটা খোলা। ওধারে সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা ডিভানে বসে আছেন শিবনাথ। খানিকটা কোনাকুনি বসার জন্য বোঝা যাচ্ছে বাঁ হাতে বুকের কাছে একটা ভায়োলিন আটকে ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ছড় টেনে যাচ্ছেন।

শিবনাথ গান-বাজনার জগতের মানুষ। যৌবনে তিনি ছিলেন মানকরা প্লে-ব্যাক সিঙ্গার। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাঁর গান ছাড়া কোন হিন্দী ফিল্মিমের কথা ভাবা যেত না। আজকাল তিনি অবশ্য গান-টান করেন না ; শিবনাথ এখন একজন মিউজিক হ্যাণ্ড মাত্র। ফিল্মের গানে, বিশেষ করে হিন্দী ফিল্মের গান চড়া সুরের অগুনতি বাজনা শোনা যায়। শিবনাথ সেই বাজনার দলে ভায়োলিন বাজান।

এই বোম্বাই শহরে রোজ গণ্ডা গণ্ডা ফিল্মের গান রেকর্ড হচ্ছে। সেদিক থেকে মিউজিক কমপোজারদের কাছে শিবনাথের ভীষণ ডিম্যাণ্ড। ফিল্ম কোম্পানিগুলো মিউজিক হ্যাণ্ডদের ভালো পয়সা-টয়সাও দিয়ে থাকে। কিন্তু টাকা-পয়সা সম্পর্কে আকর্ষণ নেই শিবনাথের। মিউজিক কমপোজাররা তিন-দিন তাগাদা দিলে তবে একদিন তিনি বাজাতে যান। যেদিন বাজাবেন বলে কথা দ্যান সেদিন ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়েন। তাদেরও-এর কাছে গান রেকর্ডিং এর যে স্টুডিও আছে সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত্তিরে ফিরে আসেন যেদিন বাজনা-টাজনা থাকে না সেদিন জুহুর এই ফ্ল্যাট থেকে বেরোন না।

এমনিতেই গান রেকর্ডিং-এর তিন চার দিন আগে মিউজিক হ্যাণ্ডদের নোটেশান দিয়ে দেওয়া হয়। তারা বাড়িতে বসে সেই নোটেশান মিলিয়ে সুর তুলে নেয়। শিবনাথও তাই করে থাকেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি ভায়োলিনে ছড় টেনে কোমল নিখাদে যা বাজিয়ে যাচ্ছেন তা কোন ফিল্মের গানের সুর না। এই সুরটা জয়ার অনেক কালের চেনা। তার ছেলেবেলায় মা যখন তাদের ছেড়ে চলে যায় তারপর থেকে কোন নির্জন দুপুরে কিংবা মধ্যরাতে শিবনাথ এই সুরটা বাজিয়ে আসছেন। কিন্তু মা'র কথাও এখন না ; পরে। তবে এটুকু বলা যায় ঐ সুরটার সঙ্গে আশ্চর্য এক বিষাদ যেন মাখানো।

শিবনাথের ঘরের সামনে এসে কখন যে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল জয়ার খেয়াল নেই। ভায়োলিনের ঐ সুরটা শুনতে শুনতে আগেও যা হয়েছে এখন তাই হল ; বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ঢেউ উঠতে লাগল। একবার সে ভাবল, আজ আর বেরুবে না। পরক্ষণেই অজয়ের মুখ মনে পড়ে গেল তার, অনেক আশা নিয়ে চার্চগেট ষ্টেশনের কাছে সে অপেক্ষা করবে

দ্বিধান্বিতের মতো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আধফোটা গলায় জয়া ডাকল, 'বাবা—'

শিবনাথ শুনতে পেয়েছিলেন। ভায়োলিনে ছড় টানা থামিয়ে তিনি ঘুরে বসলেন।

শিবনাথের বয়স ষাটের কাছাকাছি। মেদহীন ধারালো চেহারা গায়ের রং কালোও না, আবার ফরসাও না। লম্বাটে মুখ, ভাসা ভাসা বিষণ্ণ চোখ বড় বড় কাঁচাপাকা চুল অবহেলায় এলোমেলো হয়ে আছে নাকটা সটান নেমে এসেছে কপাল থেকে। সাধারণ ভারতীয়দেব তুলনায় তিনি বেশ লম্বাই, হাইট পাঁচ ফুট দশ এগারো হবে। তাঁকে ঘিরে একই সঙ্গে বিষাদ এবং আকর্ষণ যেন মাখানো রয়েছে।

শিবনাথ বললেন, 'কিছু বলবি?' বলতে বলতেই তাঁর চোখ এসে পড়ল জয়ার ওপর। ধীরে ধীরে সেই চোখে কালো মণির তলা থেকে বিস্ময় উঠে আসতে লাগল যেন।

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল জয়ার। সে তাড়াহুড়ো করে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই শিবনাথ হঠাৎ আবার বলে উঠলেন, 'এই মেরুন শাড়িটা তোকে তো বেশী পরতে দেখি নি। এর আগে দু'বার মোটে পরেছিলি, তাই না?'

জয়া চমকে উঠল। শিবনাথ যা বলেছেন তা-ই। এর আগে মাত্র দু'বারই এই শাড়িটা পরেছে সে। অজয়ের সঙ্গে আজ যেখানে যাবার কথা, শাড়িটা পরে আগেও দু বার সেখানে গেছে। শিফনের এই শাড়িটা অজয়ই তাকে এক জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। অন্য দু'বারের মতো সে জয়াকে বার বার অনুরোধ করেছে আজ যেন এই শাড়িটা পরে তার কাছে যায়।

কিন্তু শিবনাথ যে ব্যাপারটা আগেই লক্ষ্য করেছেন, জয়া টের পায় নি।

সে কী উত্তর দেবে, প্রথমটা ভেবে পেল না। আসলে শিবনাথ হঠাৎ শাড়িটা সম্পর্কে এ রকম একটা প্রশ্ন করবেন, এটা তার ধারণার মধ্যে ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জড়ানো গলায় জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

শিবনাথ এবার দূরমনস্কর মতো বললেন, 'আজ তোকে ঠিক চন্দ্রার মতো দেখাচ্ছে। সাজলে টাজলে তাকে ঠিক এই রকম দেখাতো।'

জয়া এবার হকচকিয়ে গেল। চন্দ্রা তার মায়ের নাম। কত কাল পর মায়ের নাম সে শুনল জয়া বলতে পারবে না। এ বাড়িতে তার কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করে না। কেউ বলতে শিবনাথ আর জয়া। অবশ্য সাধনা মাসীও রয়েছেন। প্রত্যেক উইক-এণ্ডে তিনি আসেন। কিন্তু তাঁর মুখেও কয়েক বছরের মধ্যে মায়ের নাম শুনেছে কিনা, জয়া মনে করতে পারল না। তবে এটা সে অনুভব করল, এত বছর বাদেও বাবা মাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

শিবনাথ বললেন, 'তুই কি বেরুচ্ছিস?'

আস্তে মাথা নাড়ল জয়া, 'হ্যাঁ।'

জয়া যে আজ অফিস যায় নি, সেটা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন শিবনাথ। একবার জানতে চেয়েছিলেন তার শরীর খারাপ টারাপ হয়েছে কিনা। জয়া বলেছিল, তার শরীর ভালই আছে। তখন আর কোন প্রশ্ন করেন নি শিবনাথ। হয়ত ভেবেছিলেন রোজ রোজ একই ধরনের কাজ করে একঘেয়ে লেগেছে, তাই আজ ছুটি নিয়েছে জয়া। মাঝে মধ্যে এক-আধদিন হঠাৎ ছুটি নিয়ে বসে জয়া, তাছাড়া রবিবারগুলো তো রয়েছে। ছুটির দিনে পারতপক্ষে সে ফ্ল্যাট থেকে বেরোয় না কিন্তু হঠাৎ তাকে সেজেগুজে বেরুতে দেখে সম্ভবত অবাক হয়ে গেছেন শিবনাথ। বললেন, 'কতদূর যাবি?'

এমনিতেই শিবনাথ জয়ার চলাফেরা সম্পর্কে কখনও কোন প্রশ্ন করেন না। কিন্তু আজ তাঁর কী হয়েছে কে জানে। জয়া বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে জড়ানো গলায় মিথ্যেই বলল, 'এই কাছা-কাছিই যাব। গোরেগাঁও-এর দিকে।' সে যে প্রপার বম্বেতে চার্চগেটে যাচ্ছে সেটা গোপনই রাখল। শিবনাথের কাছে কখনও কোন কথা লুকোয় না জয়া। কিন্তু অজয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কিছুদিন ধরে বাবার সঙ্গে তার লুকোচুরি চলছে।

শিবনাথ আবার বললেন, 'গোরগোঁওতে কে আছে রে?'

'আমার এক কলীগ—নীতা মেহেরা। আজ ওর ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।'

স্থির চোখে জয়ার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে শিবনাথ বললেন, 'তোকে নেমন্তন্ন করেছে?'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

শিবনাথ এবার বললেন, 'কই, প্রেজেন্টেশন নিয়ে যাচ্ছিস না তো?'

জয়া কোন রকমে বলতে পারল, 'লিঙ্ক বাজার থেকে কিছু কিনে নিয়ে যাব।'

একটু ভেবে শিবনাথ বললেন, 'সঙ্গে টাকা নিয়েছিস?'

'নিয়েছি।'

একটু চুপচাপ। তারপর শিবনাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিরতে দেরি হবে তোর?'

অজয় কতক্ষণ আটকে রাখবে, জয়া জানে না। সে আন্দাজে বলল, 'খুব একটা দেরি হবে না। সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যেই ফিরে আসব।' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার জন্যে চা করে রান্নাঘরে ফ্লাস্কে রেখে গেছি, বিকেলে মনে করে খেয়ে নিও। শুধু চা খাবে না, বিস্কুট দিয়ে খেও। ফ্লাস্কের পাশেই বিস্কুটের কৌটোটা আছে।'

'আচ্ছা।'

'আর সাতটার সময় ওষুধ খেয়ে নেবে।'

শিবনাথের হাই ব্লাডপ্রেসার; একবার মাইল্ড একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ঘাড়ের কাছে নিওরালজিক পেইনও আছে। নার্ভের এই যন্ত্রণাটা প্রায়ই তাঁকে ভীষণ কষ্ট দেয়। সেজন্য নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়! প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তার এসে প্রেসার মাপেন। কিন্তু জয়া মনে করে ওষুধ না দিলে তিনি খাবেন না। সে যদি ডাক্তারকে খবর না দেয় প্রেসার চেক-আপ বন্ধ থাকবে। শুধু ওষুধই না, জয়া তাড়া না দিলে কিছুই তিনি খান না। কাজের দিনে দুপুরবেলা জয়া বাড়ি থাকে না। অফিসে বেরুবার সময় বার বার সে বাবাকে দুপুরে খেয়ে নেবার কথা বলে যায়। তারাকেও বলে যায় শিবনাথকে

বাবার জন্য তাগাদা দিতে। তবু একেকদিন অফিস থেকে ফিরে জয়া ছাখে বাবার খাবার পড়ে আছে। আসলে শিবনাথ নিজের খাওয়া-দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে ভয়ানক উদাসীন।

শিবনাথ বললেন, 'ঠিক আছে, খেয়ে নেব।'

জয়া বলল, 'ভুলে যেও না কিন্তু—'

'না—না, ভুলব না।'

একটু চুপ। তারপর শিবনাথই আবার বললেন, 'নেমন্তন্ন যখন, রাত্তিরে তুই খেয়ে আসছিস তো?'

সেই রকমই কথা আছে। অজয়ের সঙ্গে সেই কাজটা চুকিয়ে রাত্তিরে কোথাও খেয়ে জুহুতে ফিরে আসবে জয়া। অজয় কোথায় খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কোন হোটেলে কিংবা ওদের বাড়িতে, সেটা অবশ্য তার সঙ্গে দেখা না হলে বলতে পারবে না জয়া। আস্তে করে জড়ানো গলায় সে বলল, হ্যাঁ, ওরা খেয়ে আসার কথা বলেছে।'

শিবনাথ বিষণ্ণ একটু হাসলেন, 'আজ আর তা হলে একসঙ্গে বসে খাওয়া হল না।'

জয়া চমকে উঠল। অফিসে চাকরি নেবার পর ত্বপুরে শিবনাথের সঙ্গে খেতে বসার সময় পায় না সে। তা ছাড়া মাসের মধ্যে পনের ষোল দিনই শিবনাথকে গান রেকর্ডিং-এর জন্য স্টুডিওতে কাটাতে হয়। কাজেই ছুটির দিন ছাড়া ত্বপুরগুলো পুরোপুরি অনিশ্চিত। তবে সকালে বা রাতে তারা একসঙ্গে বসে খায়। কিন্তু আজই প্রথম শিবনাথ আর জয়া একসঙ্গে বসে খাবে না।

জয়া জোরে শ্বাস টানল। তারপর আবছা গলায় বলল, 'ওবেলা তোমার খাবার তৈরি করে রেখেছি। রাত্তিরে ফিরে এসে গরম করে দেব।'

শিবনাথ উত্তর দিলেন না।

জয়া আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শিবনাথ ধীরে ধীরে বললেন, 'বেরুতে যখন হবে তখন আর দেরি করিস না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল জয়ার। সে যে কাজে যাচ্ছে তার আগে সব ছেলে-মেয়েই মা-বাবাকে প্রণাম করে। জয়ার একবার ইচ্ছা হল,

শিবনাথের পায়ে হাত রেখে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়। পরক্ষণেই ভাবল, প্রণাম করতে গেলে বাবা নিশ্চয়ই টের পেয়ে যাবেন। দ্বিধান্বিতের মতো অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জয়া বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও—

'আচ্ছা—'

প্যাসেজের শেষ মাথায় বাইরে বেরুবার দরজা। জয়া সেদিকে এগিয়ে এল। শিবনাথও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। জয়া বেরিয়ে যাবার পর তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাহিরে লম্বা করিডোর। তার দু'পাশে দুটো করে ফ্ল্যাট। জয়াদের ফ্ল্যাটের গায়েই যে ফ্ল্যাটটা সেখানে থাকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একজন পাইলট,তার গাবদা-গোবদা চেহারার কালো কুটকুটে জাঁহাবাজ স্ত্রী এবং এক-গাদা বাচ্চাকাচ্চা। পাইলটটির নাম মাইকেল ফ্লেচার ; ওরা কেরলী কৃশ্চান।

জয়াদের মুখোমুখি যে দুটো ফ্ল্যাট, তার একটাতে থাকে একজন জু—নাম সলোমন আব্রাহাম। দ্বিতীয়টি একজন ইজিপিসিয়ান বেলি ড্যান্সারের, তার নাম টিয়ারা। টিয়ারা অবশ্য সারা বছর এখানে থাকে না। কায়রো, প্যারিস, লণ্ডন, বেইরুট, টোকিও, ম্যানিলা, বাহেরিন —গোটা ওয়ার্লড-এর নাইট ক্লাব আর ক্যাজিনোতে মিডলইস্টের উত্তেজক বেলি-ড্যান্স দেখিয়ে মাত্র এক মাসের জন্য বম্বের কোন নামকরা ফাইভ-স্টার হোটেলে নাচের কনট্রাক্ট নিয়ে আসে।

একমাস সে ইণ্ডিয়ায় থাকে। মাত্র তিরিশটা দিনের জন্য টিয়ারা এই দামী ফ্ল্যাটটা কিনে রেখেছে।

জয়াদের ইলেভেনথ ফ্লোরের মতো এই বিশাল মালটিস্টোরিড বিল্ডং-এর প্রতিটি ফ্লোরেই চারটে করে ফ্ল্যাট। আর প্রতিটি ফ্ল্যাটেই নানা দেশের নানা জাতের নানা চেহারার মানুষ। সব মিলিয়ে এ বাড়ির পরিবেশ পুরোপুরি কসমোপলিটান।

করিডোরের এপাশে বা ওপাশে সবগুলো ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ। এই দুপুরবেলায় কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। করিডোরটা একেবারে ফাঁকা।

এ একরকম ভালোই হয়েছে। এখন বেরুবার মুখে কারো সঙ্গে দেখা হোক, জয়া এটা চায় না। বম্বের এই কসমোপলিটান আবহওয়ায় কেউ কারো সম্পর্কেই তেমন কৌতূহল প্রকাশ করে না। তবু বলা যায় না, দেখা হলে

পাইলটের জাঁহাবাজ বউ বা ইহুদী সলোমন আব্রাহামের স্ত্রী হয়ত তার এত সাজটাজের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারে। তাতে জয়া বিব্রতই হবে।

ডান দিকে করিডরের শেষ মাথায় লিফট বক্স। জয়া সেখানে গিয়ে বোতাম টিপতেই অটোমেটিক লিফট ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে ওপরে উঠে এল। সে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর নিচে নেমে বাড়ির সামনের দিকের বিরাট কম্পাউণ্ডে এসে জয়া কি ভেবে একবার ওপরে তাকাল। এই দুপুরবেলায় বিরাট বাইশ তলা বাড়িটার কোন তলাতেই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু বারো তলার ব্যালকনিতে একটি মানুষ রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। মাটি থেকে দেড়শো ফুট উচ্চতায় শিবনাথের চোখ-মুখ-নাক কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হচ্ছে তাঁর ঝুঁকে থাকা, দাঁড়ানো বা তাকাবার ভঙ্গি বড় বেশী বিষণ্ন আর ক্লান্ত। বাবাকে এভাবে আর কখনও দাঁড়াতে দেখে নি জয়া। তবে কি তিনি সব টের পেয়ে গেছেন? জয়ার বুকের ভেতর সেই কাঁপুনিটা স্রোতের মতো যেন ছোটাছুটি করতে লাগল। পলকের জন্য সে ভাবল, ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। পরক্ষণেই মনে পড়ল অনেক আশা নিয়ে অজয় চার্চগেট স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। দু-দু'বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে জয়া; আর কষ্ট দেবার মানে হয় না।

অদ্ভুত এক দ্বিধার মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জয়া। তারপর আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে এলোমেলো পা ফেলে কম্পাউণ্ডের বাইরে অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে রাস্তায় চলে এল।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন বাসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকলে তিনটের সময় চার্চগেটে অজয়কে ধরা যাবে না। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠতে উঠতে জয়া বলল, 'সান্তাক্রুজ ষ্টেশন।'

সান্তাক্রুজে আসতেই সাবার্বন লাইনের একটা ট্রেন পাওয়া গেল। রোজ অফিস করতে হয়। তাই মাসের গোড়াতেই রেলের মান্থলি টিকিট কেটে রাখে জয়া। কাজেই লাইন দিয়ে টিকিট কাটার ঝামেলা নেই। কিন্তু সাবার্বন লাইনে কোন ষ্টেশনেই ট্রেন আধ মিনিটের বেশী থামে না। তাড়া-হুড়ো করে জয়া একটা ফাষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়ল।

এই দুপুরবেলায় ট্রেনে বিশেষ ভিড়টিড় থাকে না; বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাসে। জানালার ধার ঘেঁষে জয়া বসতে না বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

দু'ধারে হাজার হাজার ফ্যাশনেবল বাড়ি; মাঝে মাঝে কুড়ি তলা বাইশ তলা হাই-রাইজ বিল্ডিং। ক্বচিৎ আরব সাগর খানিকটা ঢুকে এসে কোথাও খাড়ি তৈরি করেছে। খাড়ি ঘিরে ঝোপ ঝাড়, একটুখানি মাটি, ফাঁকা আকাশে পাখি। সিনেমার ক্রিজ শটের মতো এটুকু পার হলেই আবার বাড়ির পর বাড়ি—একটানা, ধারাবাহিক কংক্রীটের জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে ওয়েষ্টার্ন মেরুন রঙের সাবার্বন ট্রেন বল্লমের মতো ছুটে যাচ্ছে।

দু পাশে বম্বে শহরের ঠাসবুনন দম-আটকানো দৃশ্যাবলীর কিছুই প্রায় দেখছিল না জয়া ট্রেন চার্চগেটের দিকে যত এগুচ্ছে সেই কাঁপুনিটা দ্রুত বেড়েই চলেছে। এস্রাজে এলোপাতাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর কিছু একটা অনবরত ঘটে যাচ্ছে যেন। আর চোখের সামনে ব্যালকনির ওপর থেকে ঝুঁকে-থাকা শিবনাথের করুণ ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গিটা বার বার ফুটে উঠছে। বাবার এই ছবি তার মাথায় ফিক্সেশনের মতো আটকে যাচ্ছে।

এক সময় জয়ার আজান্তে সাবার্বন ট্রেন চার্চগেটে পৌঁছে গেল।

দুই

চার্চগেট ষ্টেশনের বিশাল সাত তলা বাড়িটার গায়ে মডার্ন আর্কিটেক-চারের ছাপ রয়েছে। যেদিকেই তাকানো যাক—টিফিন কাউণ্টার, শো-উইণ্ডো, শপিং আর্কেড, রেস্তোরাঁ—সব দারুণ ভাবে সাজানো। ফ্লোর আয়নার মতো ঝকঝকে এবং পরিষ্কার। এখানে ওখানে নিওন আলোয় নানা কোম্পানি এবং তাদের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন। কালো বোর্ডে ইলেক-ট্রনিকে ট্রেনের টাইম টেবল মুহূর্তে মুহূর্তে ফুটে উঠছে।

ট্রেন থেকে নেমে মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল জয়া। দূরে ষ্টেশনের প্রকাণ্ড গোল ঘড়িতে এখন তিনটে বাজতে পাঁচ। তার মানে ঠিক সময়েই সে পৌঁছে গেছে।

ষাট সত্তর ফুট উঁচু শেডের তলায় লম্বা প্ল্যাটফর্ম। তারপর সারি সারি গেট, সেখানে টিকেট কালেক্টাররা দাঁড়িয়ে আছে।

গেটে মান্থলি টিকেট দেখিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে জয়া ষ্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল।

চার্চগেটের বাঁদিকে সাবওয়ে, তার ওপারে ওয়েষ্টার্ন রেলের গথিক স্ট্রাকচারের বিশাল বাড়ি। সামনের দিকে ওভার-ব্রিজ। ব্রিজের ওধারে ব্রাবোর্ন ষ্টেডিয়াম, কোনাকুনি তাকালে এরস সিনেমা। ডান দিকে রাস্তাটা সোজা মেরিন ড্রাইভে চলে গেছে।

এধারে ওধারে তাকিয়ে কোথাও অজয়কে দেখতে পেল না জয়া।

কথা ছিল অজয় তিনটের মধ্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। জয়ার মতো সে-ও আজ অফিসে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে। যা অন্য মনস্ক ধরনের ছেলে অজয়, এখানে আসতে ভুলে গেল নাকি? জয়া পায়ে পায়ে ওভার-ব্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অজয়ের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ওভার-ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তাটা ডাইনে গেছে মেরিন ড্রাইভে, বাঁয়ে ফ্লোরা ফাউণ্টেনের দিকে। দু দিকেই হাজার হাজার ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার ঢলের মতো ছুটে যাচ্ছে। গাড়ি-মানুষ ব্র্যাবোর্ন ষ্টেডিয়ামের আর্কেডে ঝকঝকে শপিং সেন্টার, ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের নানারকম অফিস, কাছে দূরে অগুনতি হাই-রাইজ বিল্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে পুরো একটি ঘণ্টা কেটে গেল। ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় চারটে, সেই সময় জয়া একবার ভাবল ষ্টেশনের টেলিফোন বুথ থেকে অজয়দের কোলাবার ফ্ল্যাটে ফোন করে খবর নেবে কিনা। ষ্টেশনের দিকে সে পা বাড়াতে যাবে, আচমকা অজয়ের গলা শোনা গেল 'জয়া—'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই জয়া দেখতে পেল ওভার-ব্রিজের সিঁড়িগুলো যেখানে উঠে বাঁক ঘুরেছে তার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে অজয়। তার মানে রাস্তার ওপার থেকে ব্রিজ পেরিয়ে সে এসেছে।

অজয়ের বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। ছ ফুটের মতো হাইট। টান টান এরিয়ান চেহারা তার। খাড়া নাক, লম্বাটে চোখ, ঘন ভুরু, ছড়ানো কাঁধ,

চওড়া নিভাঁজ কপাল। মাথার চুল অগোছালো, গায়ের রং পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো। অজয়ের চোখে মুখে এবং তাকানোর মধ্যে এক ধরনের সরল নিষ্পাপ ছেলেমানুষি রয়েছে।

তার পরনে এই মুহূর্তে ফ্লেয়ারের প্যাণ্ট আর বুশ শার্ট। শার্টের গোটা দুই বোতাম নেই, ভেতরকার গেঞ্জি তাই অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। পায়ে ফোম বসানো চার ইঞ্চি সোলের চপ্পল।

চোখাচোখি হতেই অপরাধীর মতো মুখ করে একটু হাসল অজয়। তারপর দারুন জোরে হাত নেড়ে একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে প্রায় উড়তে উড়তেই নিচে নেমে এল। জয়া কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'সরি—এক্সট্রিমলি সরি। কতক্ষণ ওয়েট করছ?'

জয়া গম্ভীর মুখ করে বলল, 'পুরো একটি ঘণ্টা।'

ঘাড় চুলকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে অজয় বলল, 'ক্ষমা, মেমসাহেব—ক্ষমা! এবারই লাস্ট। আর কোনদিন এরকম রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখব না। নেভার—'

'কতবার এই প্রমিসটা করলে?'

'বোধহয় এক শো সাতাত্তর বার। নাকি দুশো সাতাত্তর? সে যাক গে, দিস ইজ লাস্ট।' বলেই মুখটা দারুণ কাঁচুমাচু করে হাত কচলাতে লাগল। একটুক্ষণ বাদে জয়ার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে আস্তে করে আবার বলল, 'আশা করি ক্ষমা পাবো।'

অজয়ের কাছে বেশিক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকা যায় না। জয়া হেসে ফেলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে!'

অজয় টান হয়ে দাঁড়িয়ে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল। তারপর চোখ কুঁচকে মজাদার ভঙ্গি করে হাসতে হাসতে বলল, 'গুড লাক, মেমসাহেব ক্ষমা করেছে।'

কয়েক পলক অজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল জয়া। তারপর বলল, 'তোমার আসতে এত দেরি হল কেন?'

'কী করব! অফিসে যেতে হয়েছিল—'

'আজ ক্যাজুয়াল লিভ নেবে বলেছিলে—'

'নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা এমার্জেন্সি কাজের জন্য অফিস থেকে ডেকে পাঠালে। কোন রকমে কাজটা সেরে ছুটতে ছুটতে আসছি।' বলতে বলতেই অজয়ের চোখ জয়ার ওপর আটকে গেল। এতক্ষণ সে যেন তাকে লক্ষ্য করে নি। পলকহীন বেশ কিছুটা সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুগ্ধ চাপা গলায় বলল, তুর্দান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। লাইক এ প্রিন্সেস।'

চোখ নামিয়ে আধফোটা গলায় বলল, 'ফ্ল্যাটারি!'

'মোটেও না। বিলিভ মী—'

জয়া উত্তর দিল না। অজয়ের মুগ্ধতা তার খুব ভালো লাগছিল।

একটু পরে অজয় আবার বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। বেঞ্জামিন সাহেব আমাদের জন্যে ওয়েট করেছেন।, বলেই কবজি উল্টে ঘড়ি দেখে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'চারটে পনের। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। চল চল—'

অজয়ের সঙ্গে এলোমেলো হাল্কা কথাবার্তায় সেই ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল জয়া বেঞ্জামিন সাহেবেব নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় সেই পুরনো কাঁপুনিটা আবার শুরু হয়ে গেল।

এদিকে কথাটা বলেই হাঁটতে শুরু করেছিল অজয়। জয়াও দাঁড়িয়ে থাকে নি, অজয়ের পাশাপাশি সে-ও অন্যমনস্কের মতো পা ফেলে যাচ্ছিল।

জয়া জানে, এখন তারা সোজা মেরিন লাইনসে বেঞ্জামিন সাহেবের বাড়ি যাচ্ছে। বাড়িটা এখান থেকে খুব বেশী দূরে না। হেঁটে গেলে দশ বারো মিনিটের রাস্তা। আগেও অজয়ের সঙ্গে কয়েকবার সেখানে গেছে জয়া। মেরিন লাইনসের সেই বাড়ি বা বেঞ্জামিন সাহেব, কেউ তার অচেনা নয়।

চার্চগেট স্টেশনের বাঁ দিকে সাবওয়ে। সিঁড়ি বেয়ে জয়া আর অজয় মাটির তলায় নেমে গেল। পাতালের রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠতে এক মিনিটও লাগল না।

ওপারে উঠলেই বাঁয়ে ওয়েস্টার্ন রেলের হেড কোয়ার্টার। তার পেছন দিক দিয়ে ক্রশ ময়দানকে ডাইনে রেখে অ্যাসফাল্টের চকচকে সটান যে রাস্তাটা মেরিন লাইনসে চলে গেছে, জয়া আর অজয় কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে চলে এল।

অজয় সমানে একটানা এলোমেলো কথা বলে যাচ্ছিল। জয়া কিছু

শুনছিল, বেশির ভাগই কানে ঢুকছিল না। চুপচাপ অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে শুধু অনুভব করেছিল সেই কাঁপুনিটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বড় বড় এলোপাথাড়ি ঢেউয়ের মতো কী যেন বুকের ভেতরটা বার বার তোলপাড় করে দিচ্ছিল।

যখন তারা ধোবি তালাও-এ মেট্রো সিনেমার কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল অজয়। জয়ার দিকে ফিরে বলল, 'একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।'

জয়া কিছুটা অবাকই হল, এবং উদ্বিগ্নও। বলল, 'কী হয়েছে?'

'তিন জন উইটনেস লাগবে। তাদের কথা একেবারে ভুলে গেছি।'

জয়া উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল।

অজয় এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'একবার আমার অফিসে যেতে হবে।'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'উইটনেস হবার জন্যে লোক দরকার হবে না? চল, তিনজনকে ধরে নিয়ে আসি।'

জয়া চমকে উঠল, 'না—না—' অজয় একটা বিদেশী এয়ার লাইনসে কাজ করে। তার কলীগদের প্রায় সবাইকেই চেনে জয়া। অজয়ের সঙ্গে যা সে করতে চলেছে সেই ব্যাপারটা শুধু শিবনাথই না, তার চেনা লোকজনেরাও জানুক, এটা আপাতত জয়া চায় না।

অজয় বলল, 'কী হল? যাবে না কেন?'

জয়া চুপ করে রইল।

জয়ার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই তার মনোভাব চট করে বুঝে নিল অজয়। বলল, 'ঠিক আছে।' একটু থেমে কী ভেবে আবার বলল, 'তা হলে চল, ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে একবার যাই।'

'সখানে কী?'

স্টেট গর্ভর্নমেণ্ট এমপ্লয়ীদের একটা হোস্টেল আছে। ওখানে চান্স নেব। এখন এই অফিস আওয়ার্সের ভেতর কাউকে পাব কিনা জানি না। তবে অনেকেই তো ক্যাজুয়াল লিভ টিভ নেয়। কাউকে পেলে উইটনেস হবার জন্যে ধরে নিয়ে আসব।'

জয়া ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, 'ওদের ভেতর কেউ জানাশোনা বেরিয়ে পড়বে না তো?'

অজয় চোখ কুঁচকে রগড়ের একটা ভঙ্গি করল, বেরিয়ে পড়লে স্টেট ভি-টি ষ্টেশনে চলে যাব! কলকাতা-দিল্লী-মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর—কত জায়গা থেকে লোক এসে নামছে ওখানে। যাদের সব চাইতে অচেনা মনে হবে তেমন তিনজনকে সিলেক্ট করে নেব। আর যদি—'

জয়া বলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে!'

অজয় তার কথা শুনেও শুনল না। বলে যেতে লাগল, 'ইণ্ডিয়ান উইটনেসে আপত্তি থাকলে বল। ভি-টিতে না গিয়ে তা হলে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে চলে যাই। একজন আমেরিকান, একজন ফিলিপিনো, একজন নরওয়েজিয়ান —তিন কন্টিনেন্টের তিনজন উইটনেস পাকড়ে আনি। আশা করি ওরা কেউ তোমার জানা শোনা হবে না।'

জয়া মৃদু স্বরে আরেক বার বলল, 'আবার ইয়ার্কি!'

অজয় মজা করে একটু হাসল। তারপব বলল, 'তাড়াতাড়ি চল এমনিতেই ঢের দেরি হয়ে গেছে। উইটনেস যোগাড় করতে করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তারপর মেরিন লাইনসে গিয়ে বেঞ্জামিন সাহেবকে পাবো যে, এমন কোন গ্যারান্টি নেই। ওল্ড ম্যান কতক্ষণ আর আমাদের জন্যে ওয়েট করবে!' একটু থেমে আবার বলল, 'এবারও যদি ব্যাপারটা না হয় তা হলে থার্ড অ্যাটেমপ্টটাও আন্‌সাকসেসফুল হয়ে যাবে। না কি বল!

জয়া উত্তর দিল না।

অজয়রা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ডান দিকের বিশাল রাস্তাটা ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই ক্রফোর্ড মার্কেট, মার্কেট টাওয়ারের ছুঁচলো চুড়োটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেট্রো সিনেমা পেছনে রেখে সেদিকে হাঁটতে লাগল ওরা।

ক্রফোর্ড মার্কেটের পেছনে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ হোস্টেলের বাড়িটা প্রকাণ্ড। নীচে সুপারিনটেণ্ডেন্টের অফিসে খোঁজ নিতে জানা গেল চারজন অফিসে যায় নি, ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে এবং তেতলায় আছে।

অজয়রা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখতে পেল, সামনে দিয়ে লম্বা করিডোর

এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে গেছে। তার গা ঘেঁষে পর পর সারিবদ্ধ ঘর।

করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে অজয়দের চোখে পড়ল প্রায় সব ঘরই তালা-বন্ধ। একেবারে শেষ মাথায় এসে একটা ঘর খোলা পাওয়া গেল। সেখানে চারজন যুবক দাবার ছক সাজিয়ে তার ওপর ঝুঁকে আছে।

পায়ের শব্দে খেলোয়াড়রা দরজার দিকে তাকালো। তারপর অচেনা একটি যুবক এবং তার সঙ্গে দারুণ সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়টা খানিকটা থিতিয়ে এলে এক দাবা খেলোয়াড় বলল, 'কাকে চাইছেন!'

অজয় তক্ষুনি হাতজোড় করে বলল, 'আপনাদের। আমরা আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী।'

ওরা চারজন হকচকিয়ে গেল। তারপর প্রায় একই সঙ্গে একই সুরে কোরাসে বলে উঠল, 'কী সাহায্য?'

'বলছি। তার আগে আমাদের যদি ভেতরে যাবার পারমিশান দিতেন—মানে এভাবে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।'

চার দাবাড়ু সন্দিগ্ধভাবে এক পলক কি ভেবে নিল। তারপর খুবই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আসুন, আসুন—'

জয়াকে নিয়ে অজয় ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঘরটা বেশ বড়সড়ই। ব্যাচেলারদের ডেন যে রকম হয়—শার্ট-ট্রাউজার-বই-শেভিং বক্স-আয়না-চিরুনি-খবর কাগজ-সিনেমা ম্যাগাজিন—সব চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো। চারপাশের দেওয়াল ঘেঁষে হাসপাতাল বেডের মতো চারটে 'কট'।

একটা 'কটে' জয়াদের বসতে বলে চার দাবা খেলোয়াড দারুণ কৌতূহলের গলায় বলল, 'এবার বলুন—'

অজয় হাতজোড় করেই ছিল। বলল, 'তার আগে নিজেদের ইনট্রোডিউস করে নিই। তাতে কথা বলতে সুবিধা হবে। আমি অজয় আর এ হল জয়া—আপনারা—'

দাবা খেলোয়াড়রাও তাদের পরিচয় দিল। চারজনের মধ্যে যে সব চাইতে লম্বা তার নাম অমল মাত্রে। মাথায় যে সব চাইতে খাটো সে মধু জরিওলা। গোলগাল টকটকে ফর্সা চেহারার যুবকটির নাম নবীন শিবদাসানি। আর

পাতলা ছিপছিপে মেয়েলী ধাঁচের চোখমুখ যে ছেলেটির, তার নাম রমেশ পুনেকর। তার মানে ওদের দু'জন মারাঠী, একজন গুজরাতী, একজন সিন্ধী। মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নানা ডিপার্টমেণ্টে ওরা কাজ করে। কেউ ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউতে, কেউ রিলিফে, কেউ হাউসিংএ, কেউ বা হোম পাবলিসিটিতে।

পরিচয়-টরিচয় হয়ে গেলে অজয় বলল, 'জয়া আর আমি লাইনে সেটেলড হতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের হেল্প ভীষণ দরকার।

ওরা চারজন হকচকিয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে খানিকক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। তাবপর মধু অজয়কে বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কোনরকম ধানাই-পানাই না করে অজয় এবার সোজাসুজি বলল, 'আমরা বিয়ে কবতে বেরিয়েছি। মেরিন লাইনসের এক বাড়িতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ওয়েট করছেন। কিন্তু তাড়াহুড়োতে উইটনেস আনতে ভুলে গেছি। আপনারা যদি দয়া করে সাক্ষী হন অমরা বিয়ে করার একটা চান্স পেতে পারি।' একটু থেমে আবার বলল 'অনেকদিন ধরে এই ভদ্রমহিলার পেছনে পেছনে ঘুবছি কিন্তু বিয়েটা কিছুতেই হয়ে উঠছে না। আজকের চান্সটা যদি মিস করি আবার কতদিন এঁর পেছনে এনডিওরেন্স সাইক্লিং চালিয়ে যেতে হবে কে জানে। ধৈর্য আর পারসিভিয়ারেন্সের পরীক্ষা দিতে দিতে পাঁচটা বছর কেটে গেল। এখন বলুন, আপনাদের সহানুভূতি আর সাহায্য কি পাবো না?'

জয়া চোখ নীচু করে চুপচাপ বসে ছিল। লজ্জায় তার মুখ আর কানের লতি লাল হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে ভাবতেই পারে নি এভাবে বিয়ের সাক্ষী যোগাড় করতে হবে। তার ওপর অজয় যা বলছে তাতে কারো দিকে মুখ তুলে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না। গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিল জয়া, টের পাচ্ছিল জামা-টামা ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে রমেশ মধু নবীন এবং অমল কয়েক সেকেণ্ড বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকার পর হুল্লোড় বাধিয়ে দিল। সমস্বরে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়ে বলল, 'এমন একটা ব্যাপারে হেল্প করব না মানে, নিশ্চই করব। এ তো আমাদের সেক্রেড

ডিউটি। আপনারা আমাদের বন্ধু ভাবতে পারেন।' উৎসাহে তাদের চোখ-মুখ চকচক করছিল। আসলে এ রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে কেউ আসতে পারে তা ছিল ওদের কাছে অভাবনীয়। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে উত্তেজনা যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে দারুণ একটা মজা।

অমল ভীষণ আমুদে ছেলে। জয়া যে এ ঘরে রয়েছে এবং মাত্র দশ মিনিট আগেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেটা বোধ হয় ভুলে গিয়েই এক পাক নেচে নিল সে।

অজয় বলল, 'দুঃসময়ে আপনারা হেল্প করছেন, ডেফিনিটলি আপনারা আমাদের ফ্রেণ্ড। হোল লাইফ আমরা আপনাদের কাছে গ্রেটফুল হয়ে থাকব।'

মধুরা কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'নট অ্যাট অল।'

চেহারা দেখে যতটুকু আন্দাজ করা যায়, অমলই ওদের মধ্যে বয়সে সবার বড়। হুল্লোড় একটু কমলে হঠাৎ সন্দিগ্ধ গলায় সে বলল, 'কিন্তু—' টের পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কোথাও একটা খটকা দেখা দিয়েছে।

অজয় একটু উদ্বিগ্ন হল। অমলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী?'

'পরে পুলিসের ঝামেলা হবে না তো?'

অজয় কয়েক পলক তাকিয়েই থাকল। তারপর হেসে হেসে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা একেবারে জেনুইন কেস। থানা কাছে থাকলে ও-সি'কেই সাক্ষী যোগাড় করে দেবার জন্য রিকোয়েস্ট করতাম। আপনাদের হোস্টেলটা আগে পেয়ে গেলাম, তাই ঢুকে পড়েছি।' এক দমে কথাগুলো বলে একটু থামল সে। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আমার নাম অজয় শর্মা, বাবা লেট মনোহর শর্মা, হোম অ্যাড্রেস ইউ, পি, ডিস্ট্রিক্ট শাহারানপুর, টাউন শাহারানপুর, লোকাল অ্যাড্রেস 'সী-গাল' কোলাবা, বম্বে। কাজ করি একটা ফরেন এয়ার লাইনসে। আর এ হল জয়া ব্যানার্জি, বাবার নাম শিবনাথ ব্যানার্জি কাজ করে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে—' নিজের এবং জয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য দিয়ে অজয় বলতে লাগল, 'টেলিফোন করে জয়া আর আমার অফিস থেকে সত্যি বললাম না মিথ্যে—জেনে নিন।'

অমল একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'না-না, ফোন করার

দরকার নেই। আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম। তবে কি জানেন, এরকম ব্যাপারে পরে ট্রাবলও তো হয়—'

অজয় বলল, 'গ্যারান্টি দিতে পারি আমাদের কেসটা একেবারে সাচ্চা—পুরোপুরি ট্রাবল-ফ্রী। যদি চান তো কাগজে লিখে দিচ্ছি।'

অমল দু হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—'

অজয় থামে নি। সমানে সে বলে যাচ্ছে, 'আমরা কেউ কাউকে ফুঁসলে আনিনি। আমাদের ভালো করে দেখুন—ফোঁসলাবার বয়েসটা অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি।'

তাকে থামাবার জন্য মধু ওধার থেকে বলে উঠল 'দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আপনাদের জন্যে ওয়েট করছেন, তখন বললেন না ?'

অজয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে তাই তো, প্লীজ, আপনারা রেডি হয়ে নিন—'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে অমলরা চারজন পোশাক টোশাক বদলে ফিটফাট হয়ে অজয়দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় আসতেই চোখে পড়ল, ক্রফোর্ড মার্কেটের টাওয়ার-ক্লকে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা বেজেছে। অজয় চোখেমুখে এবং গলার স্বরে হতাশা ফুটিয়ে বলল, 'গুড হেভেনস, বেঞ্জামিন সাহেবকে কি আর পাওয়া যাবে ! কতক্ষণ আর বিয়ের আসর সাজিয়ে তিনি বসে থাকবেন ! আমার এই চান্সটাও গেল। চলুন চলুন, ট্যাক্সি ধরা যাক—'

ক্রফোর্ড মার্কেটের উল্টোদিকে ফ্রুট জুস আর ফালুদা সরবতের প্রকাণ্ড দোকানটার কাছ থেকে অজয়রা দুটো ট্যাক্সি ধরল। একটা ট্যাক্সিতে অজয় জয়া আর মধু উঠল। অন্যটায় অমল নবীন এবং রমেশ। ঠিক হল, অজয়দের ট্যাক্সি আগে আগে যাবে। অমলদেরটা তার পেছনে আসবে। কেন না অমলরা বেঞ্জামিন সাহেবের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস চেনে না। ওরা উঠবার পর ট্যাক্সি দুটো সোজা ধোবি তালাও-এ মেট্রো সিনেমার দিকে দৌড় লাগাল।

খানিকটা যাবার পর আচমকা অজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রোখকে, রোখকে—'

ট্যাক্সি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গেল। দেখাদেখি পেছনের ট্যাক্সিটাও থেমে গেছে। আর তার মধ্যেই দরজা খুলে নেমে পড়ল অজয়।

জয়া উৎকণ্ঠিতের মতো জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ?'

অমলরাও হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে অজয়ের নেমে পড়ার কারণটা জানতে চাইল।

অজয় বলল, 'বিয়ে করতে যাচ্ছি। আফটার অল একটা শুভ কাজ। এই সব অকেশানে ফুলটুল তো দরকার হয়। যদিও সিগনেচার বসিয়ে বিয়ে তবু ফুলের মালা-টালা থাকলে একটা অ্যাটমসফীয়ার ক্রিয়েট হয়। আপনারা একটু ওয়েট করুন। আমি ক্রফোর্ড মার্কেটে যাব আর আসব।'

মিনিট পনেরোর মধ্যে দুটো বিরাট বিরাট ফুলের প্যাকেট কিনে ফিরে এল অজয়। মধুদের উদ্দেশে বলল, 'ফুল কিনে মার্কেটে বুথ থেকে ফোন করে একটা রেস্তোরাঁয় টেবল 'বুক' করে এসেছি আপনারা আমাদের গেস্ট। রাত্তিরে সবাই একসঙ্গে খাব।'

অমল বিব্রতভাবে বলল, 'আবার খাওয়ার ঝামেলা করলেন কেন ? বেশ যাচ্ছিলাম ; হৈ-হৈ করে সাক্ষী দিয়ে চলে আসতাম।

অজয় বলল, 'আমাদের লাইফে এত বড় একটা অকেশান ঘটতে চলেছে। আপনাদের হেল্প ছাড়া কিছুতেই তা সম্ভব হত না। না খাইয়ে আপনাদের ছাড়তে পারি!' একটু থেমে তক্ষুনি আবার বলতে লাগল, 'খাওয়াটা এমন কোন ব্যাপার না। আসলে সবাই মিলে আনন্দ করা—এই আর কি।'

অমল আর কিছু বলল না। তবে পেছনের ট্যাক্সি থেকে অমলের দিকে তাকিয়ে নবীন বলে উঠল, 'বিয়ের নেমন্তন্ন খাব আমাদের কিছু একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া উচিত।

অমল উত্তর দেবার আগেই দারুণ জোরে মাথা এবং হাত-টাত নেড়ে অজয় বলল, 'প্লীজ না ; কোন রকম ফর্মালিটি করবেন না—বলেই কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সামনের ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ল। ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'মেরিন লাইনস—'

তিন

চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি দুটো মেরিন লাইনসে যে তেতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো তার চেহারায় প্রাচীনকালের গন্ধ মাখানো। বহুকাল আগের ইংরেজি বইতে নাইনটীনথ সেঞ্চুরির ইংল্যাণ্ডের যে-সব ক্যাসেলের ছবি দেখা যায়, বাড়িটা অবিকল তেমনি। অথচ তার চারদিকে মডার্ন আর্কিটেকচারের অগুনতি স্কাইস্ক্রেপার টাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সিটিতে পুরনো বাড়ি-ঘর ভেঙে যেখানে হাই-রাইজ বিল্ডিং তৈরির উন্মাদ প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে এরকম একটা বাড়ি কিভাবে এখনও টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য।

ট্যাক্সি থেকে সবাইকে নামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অজয় বলল, 'আসুন—'

বাড়িটার নীচের তলায় তিন চারটে দোকান। তার মধ্যে একটা হল পুরনো রেকর্ডের, একটা পুরনো বাদ্যযন্ত্রের, একটা পুরনো ক্রকারির, আর একটা কিউরিও শপ। এ সবের পাশ দিয়ে ভেতরে যাবার সরু প্যাসেজ। রাস্তা থেকেই দেখা যায় প্যাসেজের শেষ মাথায় ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িব কাছে অল্প পাওয়ারের একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে।

অজয়রা ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর চওড়া চওড়া কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। দোতলার একটা দিক জুড়ে কোন একটা কোম্পানির গো-ডাউন। অন্যদিকে এক চীনা ডেন্টিস্টের চেম্বার আর এলাহাবাদী হেকিমখানার মাঝখানে বেঞ্জামিন সাহেবের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস। দরজার ওপর রং জ্বলে যাওয়া একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছেঃ 'গুড লাক ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সেণ্টার মেরিন লাইনস, বম্বে।'

দরজা খোলাই ছিল। অজয় সঙ্গীদের দিকে ফিরে নিশ্চিন্ত হবার ভঙ্গিতে বলল, 'যাক, বেঞ্জামিন সাহেব তাহলে চলে যান নি বলেই সামনে তাকালো, 'মে উই কাম ইন—'

ভেতর থেকে ভারী ধরনের বয়স্ক গলা ভেসে এল, 'কাম ইন প্লীজ।'

আগে আগে অজয়, আর তার পেছনে অন্য সবাই ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরটা প্রকাণ্ড। মেঝেতে বড় বড় চৌকো চৌকো সাদা পাথর বসানো। মাঝখানে পঞ্চাশ শাট স্কোয়ার ফুট জায়গা খুড়ে পঁচিশ তিরিশ বছর কি তারও আগে একট্রা কার্পেট পাতা হয়েছিল সেটার আদি রং কী ছিল এখন আর বুঝবার উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় কার্পেটটা ছিঁড়ে গিয়ে মেঝের পাথর দেখা যাচ্ছে। এই ছেঁড়া কার্পেটের ওপর বার্মা টীকের একটা বড় টেবল, কারুকার্য্য করা খানকতক চেয়ার পাতা রয়েছে। মাথার ওপর বড় বড় ব্লেডওলা নাইনটিন থার্টি মডেলের পাখা ঝড়াং ঝড়াং করে ঘুরে যাচ্ছিল। দেয়ালের গা ঘেঁষে ভারী ভারী তিন চারটে আলমারি বেঞ্জামিন সাহেব তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজের পুরুতের কাজ করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে কয়েক হাজার বিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার যাবতীয় রেকর্ড ওই সব আলমারিতে ঠাসা রয়েছে। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড দুটো গরাদহীন জানালা। জানালা দুটোতে একদা খড়খড়ির পাল্লা বসানো ছিল। অনেক জায়গায় খড়খড়ি ভেঙে গেছে।

এ ঘরের কার্পেট, চেয়ার টেবল, দরজা-জানালা, আলমারি—সব কিছুর মধ্যে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির একটা আবহাওয়া যেন অনড় হয়ে আছে।

এ ঘরের যেদিকে জানালা সেটা পশ্চিম দিক। এখন সোয়া পাঁচটার মতো বাজে। বাইরে প্রচুর রোদের ছড়াছড়ি, আর আছে অজস্র হাওয়া। জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আর আলোয় ঘর ঢেকে পড়েছিল।

বেঞ্জামিন সাহেব টেবলের ওধারে বসে ছিলেন। অজয়দের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। 'গুড আফটারনুন অজয়, গুড আফটারনুন জয়া –'

অজয় বলল, 'গুড আফটারনুন আঙ্কল—'

বেঞ্জামিন সাহেবকে সে আঙ্কল বলে।

জয়া ক্যাসেলের মতো এই বাড়িটায় ঢোকার পর থেকেই অনুভব করছিল, বুকের ভেতরকার সেই কাঁপুনিটা দশগুণ বেড়ে গেছে। এস্রাজে দ্রুত এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে স্নায়ুতে। আর বার বার বাবার মুখটা ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে। আবছা গলায় সে কোন রকমে বলতে পারল, গুড আফটারনুন আঙ্কল।'

বেঞ্জামিন সাহেবের বয়স সত্তর বাহাত্তর। চুল সাদা ধবধবে, নাকের

তলায় চৌকো পাকা গোঁফ। টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, বড় বড় চোখে মজা আর ছেলেমানুষি যেন মাখানো রয়েছে। গায়ের রং একসময় টকটকে ছিল ; এখন চামড়া কুঁচকে সোনরে জালি জালি মতো হয়ে গেছে।

পরনে বাচ্চাদের নিকার-বোকারের মতো ঢোলা ট্রাউজার ; কাঁধের ওপর যার ফিতে বাঁধা। ট্রাউজারের তলায় ডাবল-কাফ দেওয়া শার্ট গোঁজা রয়েছে। চোখে পুরু লেন্সের রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের গোল চশমা ; কালো কারে বাঁধা পকেট ঘড়ি। গোটা চেহারার মধ্যে ঠাকুরদা সুলভ একটা ব্যাপার আছে। আচমকা তাঁকে দেখলে আইনস্টাইনের কথা মনে পড়ে যায়।

বেঞ্জামিন সাহেব গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার খ্রীস্টান। এই বম্বে শহরে নিজেদের সমাজে যত বিয়ে হয় তিনি তাতে পুরুতগিরি করেন। শুধু তাই নয়, অন্য সমাজের এবং ধর্মমতের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের জন্যও গভর্নমেণ্টের পারমিশন নিয়ে এই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস খুলেছেন। মোট কথা যে কোন সমাজের বিয়েতেই পুরুতগিরি করা তাঁর জীবিকা।

বেঞ্জামিন সাহেব এবার অমলদের দিকে তাকালেন, 'এরা।

অজয় বলল, 'আমাদের বিয়ের উইটনেস ' বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

বেঞ্জামিন সাহেব সস্নেহে সবাইকে বললেন, 'বোসো তোমরা—,

অজয়রা বসলে তিনিও টেবলের ওধারে তাঁর চেয়ারটিতে সবার মুখোমুখি বসলেন। তারপর অজয়কে বললেন, 'ইউ আর লেট বাই টু আওয়ার্স। আমি আর কিছুক্ষণ দেখে চলে যাচ্ছিলাম—'

অজয় কাঁচুমাচু মুখে দেরি করে আসার কারণটা জানালো বিশেষ করে সাক্ষী যোগাড় করার ব্যাপারটা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল তার ওপর জোর দিল এবং কিভাবে অমলদের নিয়ে এসেছে তার নিখুঁত একটা বিবরণ দিয়ে গেল।

বেঞ্জামিন হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুমি যেরকম ফরগেটফুল, শেষ পর্যন্ত আজকের বিয়ের ডেটটা মনে রাখতে পেরেছ, তাই যথেষ্ট।'

অজয় হাসল। বাকী সবাই দেখাদেখি হেসে ফেলল। কিন্তু জয়া কারুর

কথাই শুনছিল না, দূরমনস্কর মতো জানালার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল সে। বাবার মুখ তার চোখের কাছে ক্রমশ আরো স্পষ্ট হয়ে যেন ফুটে উঠেছিল।

বেঞ্জামিন সাহেব এবার অজয়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার সব ঠিক আছে তো? অন্য দু'বারের মতো হবে না?'

অজয় বলল, 'আমার দিক থেকে এভরিথিং ইজ অলরাইট, আমি তো পাঁচ বছর ধরে রেডি হয়েই বসে আছি। আপনি জয়াদের জিজ্ঞেস করুন।'

বেঞ্জামিন সাহেব আস্তে করে ডাকলেন, 'জয়া, মাই চাইল্ড – '

জানালার বাইরে দু-আড়াই শো গজের মধ্যে মেরিন লাইনসের নতুন ফ্লাই-ওভার। তার ওপারে চৌপাট্টি বীচের একটুকরো বাদামী অংশ এবং তারও পর দিগন্ত পর্যন্ত একটানা গাঢ় নীল আরব সাগর। আরেক দিকে ছবির মতো সাজানো মালাবার আর কামবালা হিলের হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর কমপ্লেক্স। এই বিকেলবেলায় চৌপাট্টির দিকে হাজার হাজার সাগরপাখি উড়ছিল। ফ্লাইওভার আর মেরিন ড্রাইভের রাস্তা দিয়ে পোকার মতো অগুনতি প্রাইভেট কার কি ট্যাক্সি ছোটাছুটি করছিল। আবছাভাবে সেসব দেখতে দেখতে চমকে উঠল জয়া। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কিছু বললেন আঙ্কল?'

বেঞ্জামিন সায়েব জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'ইয়েস মাই চাইল্ড। আশা করি এবার তুমি মনঃস্থির করে এসেছ।'

জয়া কিছু বলল না। তার হৃৎপিণ্ডের ভেতর সেই অদৃশ্য এস্রাজের এলোপাথাড়ি ছড় টানা চলছিলই। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে তো ঘুরছেই। তা ছাড়া আরব সাগর থেকে উঠে আসা বিকেলের অফুরন্ত আরামদায়ক বাতাসও রয়েছে। তবু জয়া ঘেমেনেয়ে উঠছিল।

বেঞ্জামিন সাহেব আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'এতদিনে দ্বিধাটা যে কাটিওে উঠতে পেরেছ, তাতে আমি খুশী। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও।' শেষদিকে তাঁর গলা আবেগে ভারী হয়ে এল। মুখচোখ দেখে এই মুহূর্তে তাঁকে বড় আন্তরিক আর শুভাকাঙ্খী মনে হচ্ছে। বেঞ্জামিন সাহেব সত্যি সত্যিই জয়া এবং অজয়কে স্নেহ করেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর বেঞ্জামিন সাহেব মজা করে বললেন, 'যাক, থার্ড অ্যাটেমপ্টে বিয়েটা তা হলে ঘটল। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

অজয় দ্রুত একবার জয়াকে দেখে নিয়ে কী ভাবল। তারপর খুব আস্তে করে বলল, 'এখনও ভরসা নেই। আগে সই-টইগুলো হয়ে যাক। তখন বুঝব ব্যাপরটা সত্যি সত্যি ঘটল।'

বেঞ্জামিন সাহেব খুব সম্ভব শুনতে পাননি। তিনি হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'ফার্স্ট বিয়ের নোটিশ দিয়েছিলে তোমরা নাইনটিন সেভেনটি ওয়ানে, আর এই থার্ড নোটিশ দিলে সেভেনটি সিক্সে একটা বিয়ে হতে পুরো পাঁচটি বছর লেগে গেল।'

অজয় বলল, 'এরকম আর কিছু ক্লায়েণ্ট জুটলে দেখতে হবে আপনার প্রফেশানে তিনদিনে লালবাতি জ্বেলে দিতে হবে '

বেঞ্জামিন সাহেব প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ হেসে নিলেন, 'যা বলেছ তারপর বললেন, 'এবার তবে ফর্মালিটিগুলো সেরে ফেলি।' বলে উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুলে ছাপানো ফর্ম, জয়াদের বিয়ের নোটিশ-টোটিশ, সব নিয়ে এলেন।

জয়া শূন্য চোখে এক পলক কাগজগুলো দেখল। অনুভব করল জামার ভেতর স্রোতের মতো ঘাম নামছে। আর বাবার চেহারা ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে মেরিন লাইনসের এই পুরনো আমলের ঘর, বেঞ্জামিন সাহেব, অজয়, অমলরা চারজন, দূরে চৌপাট্টি বীচ, আরো দূরে আরব সাগর বা মালাবার হিল—সব আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে ছাড়িয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জয়া। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ঝাপসা গলায় সে বলে উঠল,'আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন—'

চোখের পলকে গোটাঘরখানায় অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এল আর এরই মধ্যে টেবিলের ওপর মাথা রেখে চাপা অস্পষ্ট শব্দ করে কাঁদতে লাগল জয়া। এর আগে আরও দু-বার ঠিক এভাবে কেঁদেছে সে।

এমন দৃশ্য বা ঘটনা অজয় এবং বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে নতুন নয়। জয়ার কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ বিষন্ন মুখে বসে রইলেন বেঞ্জামিন সাহেব।

তারপর আস্তে আস্তে উঠে জয়ার কাছে চলে এলেন। তার মাথায় সস্নেহে একটা হাত রেখে বড় কোমল স্বরে ডাকলেন, 'মাই চাইল্ড—'

জয়া জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল, 'আমি পারব না, আমি পারব না—'

'লাস্ট মোমেন্টে এসে বার বার তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? কোথায় তোমার বাধা?'

জয়া উত্তর দিল না, কেঁদেই যেতে লাগল।

বেঞ্জামিন সাহেব আবার বললেন, 'অজয়ের কথাটা ভেবে দেখ। কত আশা নিয়ে ছেলেটা একেক বার আসছে। ওকে বার বার দুঃখ দেওয়াটা কি ঠিক হবে?'

জয়া এবারও কিছু বলল না, উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে যেতে লাগল। বেঞ্জামিন সাহেব খুব কোমল স্বরে বলতে লাগলেন, 'জয়া, মাই চাইল্ড—আমার কথা শোন। মুখটা তোল—'

জয়া মুখ তুলল না।

একধারে অমলরা চুপচাপ বিমূঢ়ের মতো বসে আছে। হুল্লোড় বাধিয়ে তারা সাক্ষী দিতে এসেছিল। কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে আসার পর বিয়ের কনে যে এভাবে কান্না জুড়ে দেবে এটা তারা আগে ভাবতে পারে নি।

জয়ার ঠিক পাশেই বসে ছিল অজয়। তার চোখেমুখে পলকের জন্য দুঃখ, ক্লান্তি এবং হতাশা মাখানো একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। আস্তে করে সে বেঞ্জামিন সাহেবকে বলল, 'জয়াকে আর কিছু বলবেন না আঙ্কল।' তারপর কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে মজার ভঙ্গি করে বলল, 'ব্যাড লাক। এবারও বিয়েটা করে উঠতে পারলাম না। কিন্তু আমিও ছাড়ছি না। আরো দু বছর, চার বছর, আট বছর—যতদিন লাগে ওয়েট করব। এনডিওরেন্স কাকে বলে, দেখিয়ে ছাড়ব।'

বেঞ্জামিন সাহেব কিছু বললেন না। দুঃখিতভাবে একবার মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অজয় বলল, 'আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি আঙ্কল আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি—'

বেঞ্জামিন সাহেব বললেন, 'ডাজ নট ম্যাটার। শুভ কাজটা হলে আমি খুব খুশী হতাম অজয়।,

অজয় হাসল, 'আমি জানি। আপনি আমাদের স্নেহ করেন কিন্তু কী আর করা যাবে! যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব—'

'কী ?' বেঞ্জামিন সাহেব মুখ তুলে তাকালেন।

অজয় একটু ভাবল। তারপর ঠোঁট কামড়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল 'আপনার ফীজ—'

জোরে জোরে প্রবলভাবে হাত এবং মাথা নাড়তে লাগলেন বেঞ্জামিন সাহেব, 'নো-নো, কিছুতেই না। যে কাজ করি নি তার জন্যে কিছুতেই আমি পয়সা নিতে পারব না।'

অজয় বলল, 'কিন্তু এটা আপনার প্রফেসান '

'এর আগেও বলেছি তোমাদের ব্যাপারে প্রফেসানের কথা ভাবি না।'

কথাটা ঠিক। আগের দু-বারও শেষ মুহূর্তে সইসাবুদের সময় ঠিক এইভাবেই কেঁদেছিল জয়া। কাজেই বিয়েটা আর হয়ে ওঠে নি। ফলে অনেক জোরজার করা সত্ত্বেও বেঞ্জামিন সাহেব তাঁর পুরুতগিরির ফী-টা নেন নি।

অজয় বলল, 'দেখুন, বার বার এসে আপনাকে বিরক্ত করব অথচ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আপনিও ফীজ নিচ্ছেন না। আমার এত খারাপ লাগছে!'

,নাথিং নাথিং। ওটা নিয়ে তুমি ভেবো না।'

একটু চুপচাপ। তারপর বেঞ্জামিন সাহেব আবার বলতে লাগলেন, 'চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বিয়ের পর বিয়ে দিয়ে আসছি। আমার ক্রেডিটে কম করে দশ বারো হাজার বিয়ে রয়েছে। তোমাদের হিন্দু মাইথোলজিতে প্রজাপতি আছে না? আমি হলাম সেই প্রজাপতি। আমার কাছে প্রেমিক-প্রেমিকাদের একবারের বেশী দু-বার আসতে হয় না। এলেই বিয়ে। শুধু বিয়েই না, যারা আমার কাছ থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে তারা সবাই হ্যাপি কাপ্‌ল্‌। আমার ফোরটি ফোরটি-ফাইভ ইয়ারের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কেরিয়ারে একটাই শুধু আপসোস—তোমাদের বিয়েটা দিতে পারলাম না। তিন তিন বার তোমরা নোটিশ দিলে। তিন বারই ফেইলিওর।

তবে আমি হাল ছাড়ছি না। গ্রেভ ইয়ার্ডে যাবার আগে তোমাদের বিয়েটা আমি নিশ্চয়ই দিয়ে যাব। তার জন্যে এক শো বছরও যদি বাঁচতে হয়—বাঁচব। এমন একটা ডিসক্রেডিট নিয়ে আমি মরতে চাই না।

অজয় হাসল, 'আমার মতো আপনিও তা হলে এনডিওরেন্স টেস্ট দিতে চান ?'

'রাইট।' বেঞ্জামিন সাহেব মাথা নাড়লেন।

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর অজয় বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার আমরা উঠব আঙ্কল। তার আগে বিয়ের নোটিশটা রিনিউ করে নিন।'

বেঞ্জামিন সাহেব রেকর্ড বই বার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কবে বিয়ে করতে আসছ, বল। তারিখটা লিখে নিই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অজয়। তারপর বলল, 'একটা তারিখ দিয়ে কী হবে। জানেনই তো, আমাদের বিয়ের ব্যাপরটা পুরোপুরি আনসার্টেন। এক কাজ করুন আঙ্কল, প্রত্যেক মাসের সাত তারিখে একটা করে ডেট রেখে যান। জয়ার করুণা কবে পাব জানি না। তবে আমি লাক ট্রাই করে যাব। এ মাসে না হলে ও মাসে, নইলে তার পরের মাসে। দেখি কবে কপাল খোলে!' বলে রগড়ের ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

বেঞ্জামিন সাহেবও হাসতে লাগলেন। রেকর্ডের খাতায় প্রতি মাসে একটা করে নেটিশের তারিখ বসাতে বললেন, 'গুড আইডিয়া। গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড। আমারও শুভেচ্ছা রইল। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি এবার এলে যেন তোমরা হাসিমুখে ফিরতে পারো; আর যেন নতুন করে নোটিশ রিনিউ করতে না হয়।' আগেও দু-বার এই কথাই বলেছেন তিনি।

অজয় গম্ভীর স্বরে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ—' আসার সময় ক্রফোর্ড মার্কেট থেকে দুটো ফুলের প্যাকেট কিনে এনেছিল। সে দুটো একধারে ছোট কাশ্মীরী টেবলের ওপর পড়ে আছে। ফুলের প্যাকেট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অজয়।

দেখাদেখি আর সবাই উঠে পড়েছে। এমন কি জয়াও। এখন আর সে কাঁদছে না। তবে চোখ দুটো ফোলা এবং লালচে। সারা মুখে আশ্চর্য এক দুঃখ আর বিষাদ মাখানো। ঝাপসা গলায় জয়া বলল, 'চলি আঙ্কল—'

বেঞ্জামিন সাহেব বললেন, 'এসো। গড ব্লেস ইউ।'

মেরিন লাইনসের পুরনো ক্যাসেলের মতো বাড়িটা থেকে একটু পর অজয়রা বাইরে বেরিয়ে এল।

চার

এখন ছ'টার মতো বাজে। বম্বে শহরে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয় দেরিতে। এখনও তাই দিনটা ফুরিয়ে যায় নি। পশ্চিম দিকে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে অনেক দূরে আরব সাগরে নেমেছে ঠিক সেইখানে সূর্যটা প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের থালার মতো স্থির হয়ে আছে। তবে রোদের জোর আর নেই, আরামদায়ক নরম সোনালী আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

বাইরে এসে অজয় অমলদের বলল, 'শুধু শুধু আপনাদের কষ্ট দিলাম। কোন কাজই হল না। আই অ্যাম সরি, এক্সট্রিমলি সরি—'

অমলরা চারজন একই সঙ্গে বলে উঠল, 'আরে না-না, কষ্টের কী আছে। বরং শুভ কাজটা না হওয়াতে হৈ-হুল্লোড়টা করা গেল না।'

অজয় হাসল, কিছু বলল না।

অমল এবার বলল, 'এবার আমরা তা হলে চলি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে অজয় ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'সে কি, যাবেন মানে! রাত্রে না খাইয়ে আপনাদের ছাড়ছে কে? হোটেল 'বুক' করা রয়েছে না?'

অমল বলল, 'ক্ষমা করবেন, আপনার এই অনুরোধটা কিছুতেই রাখতে পারব না। বিয়েটা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই খেতাম।'

অজয় হাসতে হাসতে বলল, 'আমার ভরসা আছে, বিয়েটা আজ হোক, কাল হোক আর দশ বছর বাদেই হোক, একদিন না একদিন হবেই। তখন খাওয়াতে তো হবেই। টেবল যখন বুক করেই ফেলেছি তখন খাওয়াটা না হয় অ্যাডভান্সই হয়ে যাক। একটা কাজ তো এগিয়ে থাক।'

অমলরা সামন্য হেসে বলল, 'প্লীজ, ওটা পারব না আচ্ছা চলি—' একটু থেমে কি ভেবে আবার বলল, 'উইটনেসের জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না।

যখনই দরকার হবে আমাদের খবর দেবেন। সাক্ষী দিয়ে যাব। কবে বিয়েটা হয় আমাদেরও দেখবার ইচ্ছে। এনডিওরেন্স টেস্টে আমরাও নাম লেখাতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আপনাদের সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখব। যে কোন দিন আপনাদের হেল্প দরকার হয়ে যাবে।'

অমলরা হাসতে হাসতে ক্রফোর্ড মার্কেটের দিকে চলে গেল।

এখন, সন্ধ্যের আগে আগে এই সময়টায় অফিস-টফিস ছুটি হয়ে গেছে। কাছের এবং দূরের সব রাস্তায়, নতুন ফ্লাই ওভারে ঢলের মতো প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, স্টেশন ওয়াগন ছুটে চলেছে। আর আছে অগুনতি মানুষ। হাজার হাজার মানুষ স্রোতের মতো চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মুখ নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল জয়া। বুঝতে পারছিল অজয় যদিও বেঞ্জামিন সাহেব বা অমলদের সঙ্গে মজা করে, রগর করে বিয়ের ব্যাপারটাকে হাল্কা করে নিয়েছে তবু ভেতরে ভেতরে খুবই কষ্ট পেয়েছে। আমুদে স্বভাব বলে বাইরে থেকে দেখে তার দুঃখটা ঠিক টের পাওয়া যায় না। কিন্তু জয়া তাকে সাত আট বছর ধরে চেনে। অজয়ের চাউনি, হাসি বা কথা বলার বিশেষ ভঙ্গী দেখে সে বলে দিতে পারে কখন তার দুঃখ আর কখনই বা আনন্দ।

জয়া নিজেও কম কষ্ট পাচ্ছে না। সে চায় এই বিয়েটা হয়ে যাক। সে জন্য বার বার মেরিন লাইনসের পুরনো ক্যাসলের মতো এই বাড়িটায় ছুটে আসছে। কিন্তু নিজের ভেতরকার সেই পাহাড় প্রমাণ বাধাটা কিছুতেই পেরুতে পারছে না।

অজয় বলল, 'এখন কী করবে বল—'

জয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলল। আবছা গলায় বলল, 'কী করব?'

'রাস্তায় স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। চল কোথাও গিয়ে বসি—'

'কোথায় যাবে?'

একটু ভেবে অজয় বলল, 'আমার ফ্ল্যাটেই চল না।'

জয়া চমকে উঠল, 'তোমার ফ্ল্যাটে!'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ল অজয়, 'গেলে আমার চামড়া বাঁচত।'

'মানে!'

'ভেরি সিম্পল। ভেবেছিলাম থার্ড অ্যাটেমপ্টে সাক্‌সেসফুল হবই। বিয়েটা এবার হয়ে যাবে। কিন্তু এবারও হোপলেস ব্যাপার!' দুই হাতের তালু চিত করে দিয়ে একটা ভঙ্গি করল অজয়। বলতে লাগল, 'আসার সময় মাকে বলে এসেছিলাম, আজ থেকে তোমার ছেলের নাম আর আনম্যারডেদের লিস্টে থাকছে না। দস্তুরমতো একজন রেসপন্‌সিবল ম্যারেড ম্যান হয়ে সে ফিরে আসবে। মা হেসে বললেন, 'এর আগেও তো দু-বার এই কথা বলেছিলি।' আমি বললাম, এবার তুমি দেখে নিও। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে তোমার ছেলের বৌকে নিয়ে স্ট্রেট তোমার কাছে চলে আসব। এখন আমার অবস্থাটা কনসিডার কর জয়া।'

জয়া চুপ করে রইল।

অজয় আবার বলল, 'একা ফিরে গেলে মা শুধু হেসেই যাবে আর বলবে, 'তেত্রিশ বছর বয়স হল। একটা মেয়ের পেছনে সাত আট বছর ধরে ঘুরছিস। তবু বিয়েটা করে উঠতে পারলি না! কী ছেলে রে তুই!' তখন আমি কী বলব বল তো। তুমি সঙ্গে গেলে মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে সেভ করতে পারবে।'

অজয়ের মাকে জয়া চেনে। অনেক বার সে ওদের কোলাবার ফ্ল্যাটে গেছে। ভারি ভালো মানুষ তিনি। ভীষণ হাসিখুশি আর স্নেহপ্রবণ। কথা যত বলেন, তার চাইতে হাসেন ঢের বেশি! ছেলের মতোই তাঁর স্বভাবটা আমুদে। কথায় রগড় করতে, মজা করতে ভালবাসেন। জয়া গেলে কী করবেন, কী খাওয়াবেন, ভেবে পান না। ছোটাছুটি করে এটা ওটা এনে, নিজের কাছে জয়াকে বসিয়ে অনবরত তাড়া দিতে থাকেন, 'খা রে মেয়ে, খা —'

কিন্তু এই স্নেহময়ী মহিলাটির কাছে যেতে আজ আর সাহস হল না জয়ার। নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'না, আজ তোমাদের বাড়ি যাব না।'

জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয় হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, আজ যাওয়াটা অবশ্য তোমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে,

আমি একাই মাকে ফেস করব। স্ট্রেট সারেণ্ডার করে বলব, এবারও হল না মা।'

জয়া আবার মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। সে কিছু বলল না।

অজয় এবার বলল, 'মা'র কাছে যখন যাবে না তখন চল চৌপাট্টি বীচে গিয়ে একটু বসি।'

নিঃশব্দে অজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল জয়া। নতুন ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা মেরিন ড্রাইভে এসে পড়ল। বাঁ দিকে তারা-পোরওলা অ্যাকুয়েরিয়াম, তারপর পার্শী আর হিন্দু জিমখানা. পয়াংখেড় স্টেডিয়াম। তারও পর একই মাপের এবং প্রায় একই চেহারার অগুনতি বাড়ি কাতার দিয়ে পর পর দাঁড়িয়ে আছে। দূবে নরিম্যান পয়েণ্টে আর ব্যাক বে রিক্লেমেসনে বিরাট বিরাট সব হাই-রাইজ বিল্ডিং। ডান দিকে মেরিন ড্রাইভ আধখানা বৃত্তের মতো বেঁকে মালাবার হিলসে উঠে গেছে। সেখানে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে বাচ্চাদের জন্য প্রকাণ্ড জুতোর মতো চেহারার একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পার্কটাকে ঘিরে যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু স্কাইস্ক্রেপাব আর স্কাইস্ক্রেপার। সামনের দিকে অফুরন্ত আরব সাগর।

অজয় আর জয়া বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চৌপাট্টি বীচেব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে এখন অজস্র মানুষ আর মানুষ। সামনের বাস্তায় টপ স্পীডে ছুটে যাচ্ছে হাজার হাজাব প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সি।

অজয় হঠাৎ বলল, 'একটা দারুণ ঝামেলা হয়ে গেছে জয়া—'

জয়া আস্তে করে জিজ্ঞেস কবল, 'কী?'

'দাদাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম এবার আমাব বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে। দাদা অ্যাডভান্স টেলিগ্রাম করে কনগ্রাচুলেট করেছে। জানিয়েছে বৌদি আর বাচ্চাদের নিয়ে শিগগিরই বম্বে চলে আসছে। অনেক দিন আমাদের বাড়িতে বড় রকমের কোন আনন্দ-টানন্দ হয় নি। দাদা ঠিক করেছে এখানে এসে তোমার অনাবে দারুণ একটা ফাংশান করবে। এদিকে শালা আমাদের বিয়েটাই হয়ে উঠল না।' বলে হাতজোড় করে বলল, 'সরি ফর দ্য ল্যাংগুয়েজ।'

অজয়দের বাড়ির সবাইকেই চেনে জয়া। ওরা দু ভাই। অজয় আর

বিজয়। বাবা নেই। বিজয় ইণ্ডিয়ান আর্মির মেজর ; এখন রয়েছে সাদার্ন কম্যাণ্ডে। ওদের হেড কোয়ার্টার মাদ্রাজ। বিজয় বিয়ে করেছে একটি তামিল মেয়েকে। মাদ্রাজেই ওদেব আলাপ, তারপর প্রেম, অবশেষে বিয়ে। বিজয়ের স্ত্রী মোহিনী ভরতনাট্যমের নামকরা আর্টিস্ট। ওদের দুটি বাচ্চা—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

বিজয় আর মোহিনীকে দু-বার মোটে দেখেছে জয়া। আর্মিতে ছুটিছাটা কম ; তাই হুটহাট মাদ্রাজ থেকে ওরা চলে আসতে পারে না। তা ছাড়া মোহিনীবও প্রায়ই নাচের প্রোগ্রাম থাকে।

যে দু-বার জয়া ওদের দেখেছে, তাতেই ভীষণ ভালো লেগে গেছে। বিজয় খুবই হুল্লোড়বাজ, সারাক্ষণ হইচই বাধিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে ভালো-বাসে। এদিক থেকে অজয়ের সঙ্গে তার স্বভাবের প্রচুর মিল। মোহিনী বিজয়েব মতো হইচই কবতে পারে না। তবে ভারী সরল আর প্রাণবন্ত মেয়ে সে। সাউথ ইণ্ডিযায় এত নাম তার, কিন্তু একটুও দেমাক নেই। দেখতেও চমৎকার। রঙটা কালো হলেও খাড়া নাক, লম্বা টানা চোখ, কোঁচকানো কোঁচকানো অজস্র চুল, মেদহীন শরীর, সরু কোমর, তার তলায় বিশাল অববাহিকা, সটান নির্ভাঁজ হাত, লম্বা মসৃণ আঙুল। রংটা ছাড়া দ্রাবিড়িয়ানদের কিছুই পায় নি সে ; তার চেহারাব বাদবাকী সব কিছুই এরিয়ান।

অজয় আবার বলে উঠল, 'দাদা এলে মহা ফ্যাসাদ হয়ে যাবে। ও যা ছেলে, একটা কিছু কাণ্ড না করে ছাড়বে না।'

চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল জয়া। সে উত্তব দিল না ; তবে বুকের ভেতর এক ধবনের অস্থিরতা আব নার্ভাসনেস অনুভব করতে লাগল! বিজয় দারুণ আনপ্রেডিক্টেবল ; কী যে করে বসবে কে জানে।

এক সময় ওরা চৌপাট্টি বীচেব কাছে এসে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে বাদামী বালির বেলাভূমিতে নেমে গেল।

বীচে এখন প্রচুর ভিড়। অফিস ছুটির পর গাদা গাদা লোক এখানে এসে বসে আছে। আর আছে নানা দেশের টুরিস্ট—কালো কুচকুচে আফ্রিকান, কুতকুতে চোখওলা জাপানী কি কোরিয়ান, জোব্বাজুব্বি-পরা আরব, গাবদা-

গোবদা রাশিয়ান, ধারালো চেহারার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো স্প্যানিশ ইত্যাদি ইত্যাদি। থিকথিকে ভিড়ের ভেতর ছুঁচের মতো ফোঁড় তুলে তুলে ভেলপুরীওলা, বেলুনওলারা, মশলাদার চাটওলারা এধারে-ওধারে ছোটাছুটি করছিল।

জয়া আর অজয় একটু নিরিবিলি দেখে একেবারে জলের ধার ঘেঁষে গিয়ে বসল। ফুলের সেই প্যাকেট দুটো একপাশে রেখে দিল অজয়।

সূর্যটা এর মধ্যে ডুবে গেছে। তবে এখনও ভালো করে সন্ধ্যে নামে নি। আবছা ফিকে অন্ধকার উলঙ্গ বাহার শাড়ির মতো চারদিকের সব কিছুকে জড়িয়ে আছে। সামনে আরব সাগরে সিলুয়েট ছবির মতো কয়েকটা স্টিমবোট আর মোটরলঞ্চ ভেসে বেড়াচ্ছিল। হাজার হাজার সী-গাল ডানায় বাতাস চিরে চিরে সারা দিন পর এইসন্ধ্যেবেলায় পাড়ের দিকে ফিরে আসছে। পেছনে মেরিন ড্রাইভ আর চৌপাটি ড্রাইভের রাস্তায় মার্কারি ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠেছে। উঁচু উঁচু হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর মাথায় নানা রঙের নিওন আলোয় নাম-করা সব কোম্পানি আর এয়ার লাইনসের বিজ্ঞাপন ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

জয়া অন্যমনস্কর মতো বালির ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিল। আচমকা অজয় বলে উঠল, 'আচ্ছা তোমার কত বয়েস হল ?'

এমন একটা প্রশ্নের কথা এই মূহূর্তে ভাবে নি জয়া। সে হকচকিয়ে গেল, 'আমার বয়েস দিয়ে কী হবে ?'

'আরে বলই না ! একজ্যাক্ট এজটা বলবে কিন্তু—'

একটু চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'উনত্রিশ চলছে।'

'উনত্রিশেও তুমি অ্যাডাল্ট হলে না।'

'মানে ?'

'এই বয়েসে বম্বের সিক্সটি পারসেণ্ট মেয়ে মিনিমাম দুটো বিয়ে আর দুটো ডাইভোর্স করে ফেলে। আর তুমি তিন বার অ্যাটেমট নিয়ে একটা বিয়েই করে উঠতে পারলে না। নাবালিকা !'

অস্পষ্ট গলায় জয়া কি একটা বলল, বোঝা গেল না।

অজয় বলল, 'তোমার মতো ভীরু মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।' একটু থেমে বলল, 'ভয়টা কিসের বল তো ?'

জয়া এবার উত্তর দিল না। সে জানে এটা ঠিক ভয় না, অদৃশ্য অথচ প্রচণ্ড শক্তিমান এক দ্বিধা তার মধ্যে সর্বক্ষণ কাজ করে যায়। তার মাথায় ফিক্সেসনের মতো শিবনাথ যেন আটকে আছেন। বাবাব কাছে কোন কিছুই গোপন নেই জয়ার। শুধু অজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা শিবনাথকে সে জানায় নি। দু একবার অজয়কে অবশ্য তাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছে জয়া ; বাবার সঙ্গে আলাপও কবিয়ে দিয়েছে। তার বেশি কিছু না। শিবনাথ হয়ত ধরে নিয়েছেন অজয় তার বন্ধুই। কিন্তু দুজনের বন্ধুত্ব কতটা গভীর, অজয় এবং জয়া পরস্পরের কতটা কাছাকাছি চলে এসেছে, সেটা নিশ্চয়ই তিনি টের পান নি। অজয়ের যত কাছেই সে চলে আসুক তবু জয়া টের পায়, অনুভব করে—বাবার কাছে থেকে এক ইঞ্চিও দূরে সবে যেতে পারে নি। সে যেন দেখতে পায় তার চারদিকে, যতদূর চোখ যায় বাবার দীর্ঘ ছায়া স্থির হয়ে পড়ে আছে। শিবনাথের ছায়ার মধ্যেই উনত্রিশটা বছর কেটে গেল জয়ার। বাবা যেন অদৃশ্য দাগ টেনে টেনে তার চলা-ফেরার সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। জয়ার সাধ্য সেই সীমানা পেরিয়ে বাইরে পা বাড়ায় ছোট ছেলেরা সুতোয় ঢিল বেঁধে আঙুলে জড়িয়ে যে ভাবে ঘোরায় জয়াও ঠিক সেই-ভাবে শিবনাথকে ঘিরে সেই কোন ছেলেবেলা থেকে অনবরত ঘুরে চলেছে। আস্তে করে সে বলল, 'ভয় না।'

অজয় বলল, 'তা হলে বার বার এরকম করছ কেন ?

'আজ না, তোমাকে আরেক দিন বলব।' শিবনাথকে ঘিরে তার দ্বিধার কথাটা আগে কখনও অজয়কে বলে নি জয়া। অজয়ও জোর করে জানতে চায় নি! কোন ব্যাপারেই তার অশোভন কৌতূহল নেই।

অজয় কিছুক্ষণ জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'কবে বলবে ?'

'শিগগিরই একদিন।'

'ও কে—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ অজয় বলে উঠল, 'ফ্র্যাঙ্কলি একটা উত্তর দেবে ? আমি কিছু মনে করব না।'

'কী ?' ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল জয়া !

'এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার নিজের কি কোন আপত্তি আছে? আই মীন, প্রথম দিকে হয়তো ইমপালসের মাথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলে। পরে ভেবে দেখেছ—

জয়া হকচকিয়ে গেল। অজয়ের কথা শেষ হবার আগেই তার একটা হাত ধরে গভীর আবেগের গলায় বলল, 'না, না, প্লীজ না। আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে আমি চাই। এ বিয়ে হবে না, এমন কথা আমি ভাবতে পারি না।'

অজয় উত্তর দিল না। সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। চৌপাট্টি বীচের ভিড় ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। মেরিন ড্রাইভে এখন আর গাড়ির স্রোত নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা সত্তর মাইল স্পীড তুলে ছুটে যাচ্ছে। আরব সাগরের হু-হু হাওয়া ছাড়া চারদিকের শব্দ ঝিমিয়ে পড়েছে। ওধারে অনেক দূরে সমুদ্রের তলা থেকে রূপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠে এসেছে। টুনি লাইটের মতো অসংখ্য তারা দিয়ে এখন আকাশের সারা গা সাজানো।

কতক্ষণ বসেছিল, ওদের খেয়াল নেই। একসময় জয়া বলে উঠল, 'চল, এবার যাওয়া যাক।'

অজয় ফুলের প্যাকেট দুটো নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'হ্যাঁ চল—'

চৌপাট্টি বীচ পেছনে রেখে মেরিন ড্রাইভের আয়নার মতো ঝকঝকে রাস্তা পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা চার্চ গেট স্টেশনের কাছে এসে পড়ল।

অজয় বলল, 'চল, তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাই।'

জয়া বলল, 'কিছু দরকার নেই। আমি চলে যাচ্ছি। রাত হয়ে গেছে, তুমি বাড়ি যাও—'

অজয়রা প্রপার বম্বেতেই থাকে। হেঁটে গেলে এখান থেকে পনের কুড়ি মিনিটের রাস্তা। অজয় কিন্তু শুনল না, জয়ার সঙ্গে স্টেশনের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর ঢুকেই হঠাৎ কি মনে পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'একেবারে ভুলে গেছি। এক্ষুণি একটা ফোন করতে হবে'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এসোই না—'

স্টেশনের ভেতরেই অনেকগুলো পাবলিক টেলিফোনের বুথ। এখন সেখানে ভিড়টিড় নেই। একটা বুথে ঢুকে ডায়াল করে অজয় বলতে লাগল, 'যে টেবলটা 'বুক' করেছিলাম কাইণ্ডলি ক্যানসেল করে দেবেন। এক্সকিউজ মী ফর দ্য ইনকনভেনিয়েন্স।'

জয়া বুঝতে পারছিল, বিয়ের পর হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অজয় সেটা নাকচ করে দিল। জয়ার মন গভীর বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল। মনে হল, কান্নার মতো কী একটা যেন তার গলার কাছে উঠে এসে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে।

বুথ থেকে বেরিয়ে হোটেলের বিষয়ে একটা কথাও বলল না অজয়। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে জয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে সান্তাক্রুজের ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। জয়া একটা ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেণ্টে উঠে জানালার ধারে এসে বসল। অজয় জানলার বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে রগড়ের ভঙ্গিতে ফুলের প্যাকেট দুটো উঁচু করে তুলে ধরে বলল, 'সবাই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফেরে। আমি শালা এই ফুলের প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরব।' বলেই জিভ কাটল, 'খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যে ক্ষমা চাইছি—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক ট্রেন স্টার্ট নিয়ে দৌড় শুরু করল।

পাঁচ

জুহু-তারা রোডে তাদের সেই মাল্টি-স্টোরিড এ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে জয়া যখন ফিরে এল, দশটা বেজে গেছে। নীচে লিফ্‌টবক্সের কাছে আসতেই সে দেখতে পেল, বুড়ো আব্রাহাম সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এক্স-মাসে বড় বড় কনফেকসানারদের শোউইণ্ডোতে সান্তাক্লসের যে মূর্তি সাজানো থাকে, দাড়িটা বাদ দিলে আব্রাহাম সাহেবের চেহারা অবিকল সেই রকম। বুড়ো এই মানুষটা জাতে ইহুদী। জয়াদের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা ওঁর। আব্রাহাম সাহেব, তাঁর স্ত্রী এবং মারাঠি এক বাঈ ছাড়া ওঁদের ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না। সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ারের পর নতুন ইজরেইল স্টেট যখন হল তখন থেকেই

ইণ্ডিয়ার জু'রা সেখানে চলে যাচ্ছিল। গত দশ বারো বছরের মধ্যে আব্রাহাম সাহেবের ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়স্বজনরা ইণ্ডিয়া ছেড়ে ইজরাইল চলে গেছে। তেল আভিভে আব্রাহাম সাহেবের ছেলেদের এখন মস্ত বিজনেস। বার বার মা-বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য তারা তাগাদা দিয়েছে, এখনও দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আব্রাহাম সাহেব বা তাঁর স্ত্রী দু একবার বেড়াতে গেলেও সেখানে থাকেনি। ছেলেদের যুক্তি হল, এতকাল আমাদের হোমল্যাণ্ড ছিল না, তাই দেশে দেশে নোম্যাডদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন আমাদের নিজস্ব একটি দেশ হয়েছে ; স্বদেশ ছেড়ে হা-ঘরের মতো পরের মাটিতে পড়ে থাকব কেন ? আব্রাহাম সাহেবের হিসেব অন্যরকম। তিনি মনে করেন ইণ্ডিয়ায় আট-দশ জেনারেশন ধরে তাঁরা আছেন। এখানেই তাঁদের জন্মকর্ম, সব কিছু। জন্মভূমি ছেড়ে তাঁরা যাবেনই বা কেন ? তিনি ইণ্ডিয়া ছেড়ে যান নি। মনেপ্রাণে আব্রাহাম সাহেব ভারতীয়।

যৌবনে এই বম্বে শহরে কাপড়ের ব্যবসা-ট্যাসা করতেন তিনি। প্রচুর পয়সা করেছিলেন। তার বেশির ভাগটা দিয়ে বড় বড় কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন আর ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। বছরের শেষে মোটা ডিভিডেণ্ড এবং ইণ্টারেস্ট পান। এখন আর ব্যবসা করেন না। সুদের টাকায়, খুব ভালোভাবেই চলে যায়। শখ বলতে সপ্তাহে একদিন মহা-লছমীতে গিয়ে রেস খেলা। তবে একটা লিমিট আছে, উইকে পাঁচ শো টাকা। দ্বিতীয় হবিটি হল, খবরের কাগজে নিয়মিত চিঠি লিখে যাওয়া। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু হল ভারতের, বিশেষ করে বম্বে শহরের উন্নতি। কোথায় রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে দুষ্প্রাপ্য একটি গাছ কাটা হয়েছে, অমনি একখানা চিঠি লিখে ফেললেন। কোথায় ল্যাভাটরি নেই, কোথায় কোন ঝোপড়পট্টিতে হেলথ সেণ্টার দরকার, মাধ আইল্যাণ্ডের পাখিদের কারা মেরে ফেলছে, সবুজ গাছপালা কেটে কোথায় উঁচু উঁচু কংক্রীটের জঙ্গল উঠছে—এসব ব্যাপারে নিয়ম করে প্রতিদিন অন্তত একখানা চিঠি তাঁর লেখা চাই। বম্বে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন যে সিটিজেন্স কমিটি করেছেন তিনি তার ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

এই বিশাল মেট্রোপোলিসে কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। যে যার নিজেকে নিয়েই আছে। কিন্তু আব্রাহাম সাহেব আলাদা ধাঁচের মানুষ।

এই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে তিনি সকলের খোঁজ নেন। সবার সম্বন্ধেই তাঁর অঢেল স্নেহ আর আন্তরিকতা।

আব্রাহাম সাহেব বললেন, 'আরে জয়া যে, এত রাত্তিরে!'

বম্বে শহরে দশটা খুব একটা বেশি রাত না। কিন্তু আব্রাহাম সাহেব জানেন, জয়া এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে না। সাতটা, বড় জোড় সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসে।

জয়া কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। বলল, 'আমার একটা নেমন্তন্ন ছিল।'

'ও, আচ্ছা—' বলেই বোতাম টিপে অটোমেটিক লিফ্‌ট্‌টা নীচে নামিয়ে আনলেন। তারপর বললেন, 'এসো—'

দুজনে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে আবার বোতাম টিপলেন আব্রাহাম সাহেব। একটানা ঝিল্লিস্বর তুলে লিফ্‌ট উঠতে লাগল।

জয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি এত রাতে কোত্থেকে ফিরলেন আঙ্কল?'

আব্রাহাম সংক্ষেপে জানালেন, আসছে শনিবারের রেসে কোন্ ঘোড়াটার ওপর বাজী ধরবেন সে সম্পর্কে কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কনফারেন্স করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে লোকাল সিটিজেনদের নিয়ে একটা মিটিং করেছেন। কারণ জুহু অঞ্চলের গাছপালা কেটে যেভাবে বাড়ি বানানো হচ্ছে তাতে দু-চার বছরের মধ্যেই জায়গাটা মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। যেভাবেই হোক এটা বন্ধ করতেই হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জয়া অল্প হাসল। বলল, 'সারা দিন তা হলে অনেক প্রবলেম নিয়ে কাটিয়েছেন।'

আব্রাহামও হাসলেন. 'এ তো রোজ লেগেই আছে। তবে প্রবলেমের এখনও শেষ হয় নি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় শুনে গিয়েছিলাম আজ রাত্তিরে ফ্লেচার ফিরবে। তার মানেটা বুঝতেই পারছ—'

ফ্লেচার হল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সেই পাইলটটি। জয়া চমকে উঠে বলল, 'তার মানে আজ রাতের ঘুমটা গেল।'

আব্রাহাম উত্তর না দিয়ে হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিলেন। একটু পর লিফ্‌ট্‌টা ইলেভেনথ ফ্লোরে পৌঁছে গেল।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখা গেল, সামনের প্যাসেজে বেহেড মাতাল 'ফ্লেচার এসে গেছে দেখছি।'

পায়ের শব্দে কোনরকমে ঘাড় ফেরালো ফ্লেচার; তারপর হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। প্রথম বার পারল না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল। চার পাঁচ বারের চেষ্টায় শরীরটাকে শেষ পর্যন্ত প্যাসেজ থেকে টেনে তুলল।

ফ্লেচারের বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। মাঝারি হাইট, লম্বাটে মুখ চুল মাথার চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো; তার ওপর চকচকে পালিশ লাগানো যেন। চোখ দুটো এই মুহূর্তে টকটকে লাল এবং নেশার ভাবে আধবোজা। প্রাণপণে সে অবশ্য চোখ মেলে রাখতে চাইছে।

জড়ানো গলায় আব্রাহামের উদ্দেশে ফ্লেচার বলল, 'তুমি এসে গেছ আঙ্কল। বাঁচলাম। তোমার জন্যেই পাক্কা এক ঘণ্টা ওয়েট করছি। এবার ওই দজ্জাল, জাঁহাবাজ, গাটাব স্নাইপ, নরকের নেড়ী কুত্তী মাগীটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর -' এই বাছা বাছা বিশেষণগুলো যার সম্বন্ধে ফ্লেচার ছুঁড়ে দিল সে তার স্ত্রী।

ব্যাপারটা পুরনো বছর দশেক হলো জয়ারা জুহু-তারা রোডের এই বাড়িটায় উঠে এসেছে। আর তখন থেকেই এটা দেখে আসছে।

মানুষ হিসেবে ফ্লেচার খারাপ নয়। ভদ্র, ফুর্তিবাজ, সরল এবং রীতিমত প্রাণখোলা। কোন রকম ঝামেলা বা প্যাঁচট্যাচের মধ্যে নেই। কিন্তু মদটা, বিশেষ করে এখানকার কান্‌ট্রি লিকার ঠার্‌রার কথা যদি একবার মনে পড়ে যায়, আর যদি প্লেন নিয়ে কোথাও উড়বার ব্যাপার না থাকে, তাকে কিছুতেই আটকানো যাবে না। সোজা সে চলে যাবে ডাণ্ডা কি মাহিমের জেলে-পাড়ায়। সেখানে গলা পর্যন্ত ঠার্‌রা গিলে বেহুঁশ হয়ে নর্দমা কি রাস্তার ধারে পড়ে থাকবে। নেশাটা ফিকে হয়ে এলে আবার গলা পর্যন্ত বোঝাই করবে। একটানা দু-তিন দিন এ রকম চালাবার পর তৃতীয় কি চতুর্থ দিন টলতে টলতে বাড়ি ফিরবে। এবং দরজায় টোকা দিলেই শুরু হবে দুর্দান্ত পারি-বারিক নাটক। ফ্লেচারের দুর্ধর্ষ বউ এলসা একই সঙ্গে গলা এবং হাত-পা

চালিয়ে ফ্লেচারের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে নাক-মুখ বা হাত-পায়ের কিছু একটা ভেঙেচুরে থেঁতলে তবে ঘরে ঢুকতে দেবে।

প্রথম প্রথম এ রকমটাই হতো। তারপর কি করে যেন ফ্লেচার টের পেয়ে গেছে এই বাড়িতে একমাত্র আব্রাহামকেই একটু আধটু শ্রদ্ধাভক্তি করে এলসা এবং তাঁর কথা শোনে। তাই দু-চার দিন বাদে মদে চুর হয়ে ফিরে সে আর কলিং বেলে আঙুল ঠেকায় না, সোজা গিয়ে আব্রাহামকে ডাকে। আব্রাহাম তাঁর ফ্ল্যাটে না থাকলে প্যাসেজে ঘাড়মুখ গুঁজে অপেক্ষা করতে থাকে। তিনি ফিরে এলে এলসাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফ্লেচারকে ঘরে ঢুকিয়ে দেন। অবশ্য তাঁর সামনে এলসা কিছুই বলে না; শুধু শরীরের সব রক্ত তার চোখে জমা হতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে স্বামীকে দেখতে দেখতে আচমকা ছোঁ মেরে চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে ফ্ল্যাটের ভেতর টানতে টানতে নিয়ে যায় এলসা।

ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই শেষ হয় না। আব্রাহামের সম্মানে কিছু না করলেও ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে গাঁকগাঁক করে করে ইংরেজা এবং মালয়ালম ভাষায় জবরদস্ত খিস্তিগুলো এক নিশ্বাসে আউড়ে যায় এলসা দুধের বোতল কি বা স্টিলের টোস্টার দিয়ে ফ্লেচারের হাত-পায়ের জোড় আলগা করবার পর ড্রপ সিন পড়ে। আব্রাহাম থাকলে পরিবারিক কেলেঙ্কারিটা আর বাইরে হতে পারে না, ফ্লেচারের পক্ষে এটুকুই নীট লাভ।

আব্রাহাম বললেন, 'আবার ঠাবুরা গিলে এসেছ!'

ফ্লেচার অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে নিজের কানদুটো খুঁজে বার করে সমানে মলতে থাকে, আর বলে, দিস ইজ লাস্ট আঙ্কল। আর কক্ষণো খাব না। যীশুর দিব্যি—' এই প্রতিজ্ঞাটা দশ বছর ধরে করে আসছে সে।

'এর মধ্যে আবার পুওর যীশু বেচারাকে টানাটানি কেন? ওঠো—'

এর পর কী কী হবে জয়া সবই জানে। সে আর দাঁড়াল না। সোজা নিজেদের ফ্ল্যাটের কাছে এসে দেখল -দরজাটা খোলাই রয়েছে। তার মনে পড়ল, দুপুরে বেরুবার সময় বাবা ভেতর থেকে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে কি ঘাটকোপার থেকে তারা ফিরে এসেছে? ভেতরে গিয়ে হয়ত আর দরজা বন্ধ করে নি সে। অন্য কেউও এসে থাকতে পারে, বা কোন

কারণে শিবনাথ দরজা খুলে আর বন্ধ করেন নি। বাবা যা অন্যমনস্ক মানুষ !

জয়া ভেতরে ঢুকে আস্তে করে দরজায় ছিটকিনি আটকে দিল। তারপর প্যাসেজ ধরে সামনের দিকে যেতে যেতে শিবনাথের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। জয়া দেখতে পেল, ওধারের ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ারে বসে আছেন শিবনাথ এবং একজন মহিলা। সমুদ্রের দিকে তাঁদেব মুখ ফেরানো। তবু পেছন থেকে এক পলক দেখেই বাবার পার্শ্ববর্তিনীকে চিনতে পারল জয়া। সাধনা মাসী—সাধনা পুনেকর। এমন বসার ভঙ্গি সাধনা মাসী ছাড়া আর কারও হতে পারে না। দরজটা রয়েছে এতক্ষণে বোঝা গেল।

জয়া মনে মনে একবার ভাবলো আজ বুধবার; সাধনা মাসীর আজ আসার কথা নয়। তিনি আসেন উইক-এণ্ডে অর্থাৎ শনিবারে। শনিবার রাতটা এবং রবিবার গোটা দিন কাটিয়ে সোমবার ভোরে ডেকান কুইনে সোজা পুণায় চলে যান। হঠাৎ কী এমন হল যাতে সপ্তাহের মাঝখানে বুধবার তাঁকে চলে আসতে হয়েছে !

শিবনাথ বা সাধনা, কেউ কথা বলেছেন না। জুহু বীচের ওপারে বিপুল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। সেই কবে থেকে, জয়ার মনেও পড়ে না, এভাবে দুজনকে নিঃশব্দে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে আসছে ! এমন করে ওরা যখন বসে থাকেন, জয়া ডাকে না। কিন্তু কেন আজ সাধনা চলে এলেন সেটা জানার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। খানিকটা দুশ্চিন্তাও। এক পলক দ্বিধা করল জয়া। তারপর ডাকল, 'সাধনা মাসী—'

শিবনাথ আর সাধনা দুজনেই এধারে মুখ ফেরালেন। সাধনা বললেন, 'ও. তুই এসে গেছিস ?' বলতে বলতে উঠে তার কাছে চলে এলেন।

শিবনাথও আর বসে থাকলেন না ; তিনিও উঠে এলেন।

সাধনা বললেন, 'তোর জন্যেই বসে ছিলাম। কেমন আছিস ?'

সাধনার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রঙ ফরসাও না, কালোও না ; দুয়ের মাঝামাঝি। ডিমের মতো লম্বাটে মুখ। ঠোঁট ঈষৎ ভারী, বড় বড়

গভীর চোখ। শরীরে বয়সের ভার পড়েছে। চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর তার। পরনে হালকা রঙের এমব্রয়ডারি কাজ-করা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। হাতে সোনার ব্যাণ্ডে চৌকো মতো বড় একখানা ঘড়ি ছাড়া আর কোন গয়না-টয়না নেই। তাঁকে ঘিরে যা রয়েছে তা হল এক ধরনের ব্যক্তিত্ব। মেয়েরা বিরাট চাকরি-টাকরি করলে খানিকটা পুরুষালি ভাব এসে যায়। কিন্তু জয়া জানে বাইরে রুক্ষতার কিছু ছাপ পড়লেও সাধনা মাসীর ভেতরটা আশ্চর্য নরম। জয়া বলল, 'ভালো আছি। তুমি কখন এলে?'

সাধনা বললেন 'সাড়ে সাতটা আটটার সময়।'

'আজ হঠাৎ চলে এলে! শরীর খারাপ হয় নি তো?'

'আরে সে সব কিছু নয়। ইয়ার এণ্ডিং হয়ে এল। অনেকগুলো ক্যাজুয়েল লীভ পাওনা আছে। একঘেয়ে অফিস আর ভালো লাগছিল না; চলে এলাম।'

'খুব ভালো করেছ।' বলেই শিবনাথের দিকে ফিরল জয়া, 'তুমি ওষুধ-টোষুধ ঠিকমতো খেয়েছিলে?'

শিবনাথ বললেন, 'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। সাধনা এসে তাড়া দিয়ে খাইয়ে ছাড়ল।' বলে হাসলেন।

শিবনাথের স্বভাব জয়া যতটুকু জানে, সাধনা তার চাইতে এক চুল কম জানে না। বরং হয়ত বেশীই জানে। ছেলেবেলায় মা তাদের ছেড়ে চলে যাবার পর সাধনা মাসীই তাড়া দিয়ে বাবাকে খাওয়াতে বেড়াতে নিয়ে যেত, ডাক্তারের কাছে পাঠাত। তখন তারা থাকত সায়নে; পাশাপাশি বাড়িতে। পরে অবশ্য বড় হয়ে বাবার সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে জয়া। শিবনাথের স্বভাব তার অনেক আগে থেকেই জানেন সাধনা।

জয়া বলল, তাড়া না দিলে কোন কাজটা তুমি কর?' বলতে বলতে আচমকা লক্ষ করল, সাধনা তার মেরুন রঙের শাড়ি এবং সাজসজ্জার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভেতরে ভেতরে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

শিবনাথ হাসলেন, 'তা যা বলেছিস!' দুপুরবেলা জয়া যখন বেরিয়ে যায় তখন তাঁকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল এখন কিন্তু সেই বিষাদটা আর নেই।

চোখেমুখে খুশির মতো কিছু একটা ফুটে উঠেছে। জয়া জানে, সাধনা এখানে এলেই তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেন।

শিবনাথ আবার বললেন, 'মনে করে প্রেজেণ্টেসন কিনে নিয়ে গিয়েছিলি তো ?'

বন্ধুর বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার দেওয়া হয়েছে কিনা, জানতে চাইছেন শিবনাথ। জয়া বিব্রত হয়ে পড়ল। দ্বিধান্বিতের মতো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ।' বলেই দেখল, সাধনা তাঁকে লক্ষ করছেন।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কী দিলি বন্ধুকে ?'

কী উত্তর দেবে, চট করে মনে করতে পারল না জয়া। বেশ খানিকক্ষণ এধার-ওধার হাতড়ে আনাড়ীরা যেভাবে মিথ্যে বলে সেই রকম বলল, 'বন্ধুকে একটা লেডীজ ব্যাগ দিয়েছি আর তার হাজব্যাণ্ডকে সিগারেট কেস।' বলতে বলতে অনিবার্যভাবে তার চোখ সাধনার দিকে চলে গেল। তিনি আগের মতোই তাকিয়ে আছেন।

শিবনাথ এবার বললেন, 'পেট ভরে খেয়েছিস তো ?'

কোন রকমে মাথা নাড়ল জয়া, 'হ্যাঁ —'আজ রাতটা তোকে উপোষ দিয়েই থাকতে হবে। উপায় নেই।

'যা, ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে ফ্যাল।'

জয়া আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরে চলে এল। তারপর ওয়ার্ডরোব থেকে ঘরে পরার শাড়ি জামাটামা বার করে বাথরুমে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে পোশাক বদলে ফিরে এসে দেখল সাধনা তাঁর খাটে বসে আছেন। এ ঘরে দুটো সিঙ্গল-বেড খাট রয়েছে। একটা জয়ার, অন্যটা সাধনার। উইক-এণ্ডে সাধনা এখানে এসে ওই খাটটায় ঘুমোন। শিবনাথ তাঁর জন্য ওটা কিনে এনেছেন।

যে শাড়িটাড়ি পরে জয়া বেরিয়েছিল সেগুলো এখন তার হাতে ঝোলানো রয়েছে। সাধনা শাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'তোর এই কাপড়টা তো আগে দেখি নি। কবে কিনলি ?'

জয়ার ক'টা শাড়ি, ক'টা জামা, ক'জোড়া জুতো, সব জানেন সাধনা। শিবনাথের কাছে ইচ্ছে করলে তবু গোপন করা যায়, কিন্তু সাধনার চোখে

ধুলো ছিটনো অসম্ভব। অজয় এই শাড়িটা দেবার পর কী কষ্ট করে যে লুকিয়ে রেখেছে, জয়াই শুধু জানে। কাঁপা গলায় সে বলল, 'গেল মাসে কিনেছি।'

'কই, আমাকে দেখাস নি তো!'

'ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুই তো এ রকম ক্যাটকেটে চড়া পছন্দ করিস না!'

'একটা পরতে ইচ্ছে হয় না?' বলে আর দাঁড়াল না জয়া। আসলে সাধনার দিকে তাকাতে পারছিল না সে। প্রতি মূহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, সাধনার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সোজা ওয়ার্ডরোবটার সামনে এসে পাল্লা খুলে একটা হ্যাঙ্গারে শাড়ি-টাড়িগুলো ঝুলিয়ে রাখল জয়া। সারাদিন পরে থাকার ফলে জামা-কাপড় কুঁচকে মুচকে গেছে। আজ আর হল না; কাল এক সময় ওগুলো ইস্তিরি করে রাখতে হবে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা বন্ধ করতে করতে জয়া আবার বলল, 'তোমরা খেয়ে নিয়েছ তো সাধনা মাসী?'

সাধনা বললেন, 'না। তোর বাবার সঙ্গে বসে বসে কথা বলছিলাম—'

'এত রাত হয়ে গেছে, এখনও খেয়ে নাও নি? যাও যাও—' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল জয়ার। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আমি বাবার মতো রান্না করে রেখেছিলাম। গ্যাসে ভাত বসিয়ে দিচ্ছি। ঘরে ডিম, দুধ-টুধ আছে —'

সাধনা বললেন, 'তোকে অত ভাবতে হবে না। আমি এসে ভাতটাত করে নিয়েছি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'চল—'

জয়া ঘুরে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাব?'

'কোথায় আবার, খেতে—সাধনা উঠে দাঁড়ালেন।

জয়া চমকে উঠল 'আমি তো খেয়ে এসেছি।'

স্থির চোখে জয়ার মুখের দিকে তাকালেন সাধনা। বললেন, 'তোকে কতদিন দেখছি বল তো?'

জয়া উত্তর দিল না। মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সাধনা আবার বললেন, 'খাওয়া হয়েছে কি হয় নি, তোর মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি। আয়—'

জয়া বুঝল, খাওয়ার ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য কত আর মিথ্যে বানানো যায়! চুপচাপ সাধনার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে সাধনা শিবনাথকে ডাকলেন, 'খেতে এসো'

ফ্ল্যাটের শেষ মাথায় ডাইনিং স্পেস। একটা মাঝারি টেবিল ঘিরে খানছয়েক ফ্যাশনেবল চেয়ার বসানো রয়েছে। একধারে ফ্রিজ, আরেক ধারে আলমারিতে দামী দামী নানা রকম ক্রকারি।

জয়ারা সোজা সেখানে চলে এল। জয়াকে বসতে বলে গ্যাস জ্বালিয়ে ক্ষিপ্র হাতে খাবার গরম করে প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে ফেললেন সাধানা। এখানে এলে কাউকে তিনি কিছু করতে দ্যান না; এমন কি তারা থাকলে তাকে ও না।

এরই মধ্যে শিবনাথ এলেন। চেয়ার টেনে বসতে বসতে জয়াকে খাবার টেবিলে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি, তুই! বন্ধুর বাড়ি থেকে খেয়ে আসিস নি তা হলে?'

জয়া হকচকিয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে একটা মিথ্যের জন্য যখন সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সেই সময় সাধনাই বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমারই তো মেয়ে। জানো না, কাছে বসিয়ে না খাওয়ালে খাওয়া হয় না। কী খেয়ে এসেছ; পেট ভরে নি।

শিবনাথ আর কিছু জানতে চাইলেন না।

জয়া আর শিবনাথের সামনে খাবার দিয়ে নিজেও খেতে বসে গেলেন সাধনা।

শিবনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পাশের ফ্ল্যাটে এলসার চিৎকার শোনা গেল। সেই সঙ্গে কাপ-প্লেট এবং কাঁচের গেলাস আর বোতল ভাঙার শব্দ শোনা যেতে লাগল। এই কেরেলী মেয়েমানুষটির গলার শক্তি এত বেশী যে মালটি-স্টোরিড বাড়িটার ভিত পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। অর্থাৎ ফ্ল্যাটে ঢোকাবার পর এলসা তার স্বামীটির হাড়-মাংস একটু এধার-ওধার করে দিচ্ছে।

শান্ত গলায় সাধনা বললেন, 'ফ্লেচার বুঝি ক'দিন বাদে ফিরল?' ফ্লেচারের ব্যাপারটা সাধনা জানেন।

শিবনাথ বললেন, 'দেখিনি ; তবে 'অপারেশান-এলসা'র আওয়াজ শুনে তাই মনে হচ্ছে।' এলসার এই মারধোর এবং গাঁক গাঁক করে চিৎকারকে এ বাড়ির সবাই বলে 'অপারেশান-এলসা '

সাধনা বললেন, ঘণ্টাখানেক এখন তা হলে এলসার চেঁচামেচি শোনা ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই।'

ছয়

খাওয়া-দাওয়ার পর শিবনাথ তাঁর ঘরে-চলে গেলেন। সাধনা আর জয়াও সঙ্গে সঙ্গে গেল। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে দু-বার জল খাওয়া শিবনাথের অভ্যাস। তা ছাড়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা কষ্ট আছে তাঁর। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই নাক বুজে যায়। নাকের প্যাসেজ পরিষ্কার করার জন্যে স্প্রে করে ওষুধ দিতে হয়।

শিবনাথের-খাটের পাশে ছোট টেবলে দু গেলাস জল আব নাকের ওষুধ রেখে সাধনাকে নিয়ে জয়া তার ঘরে চলে এল। এসেই দরজা ভেজিয়ে সাধনা পোশাক বদলে একটা ঢোলা হাউস কোট পরে নিলেন। জয়াও একটা হাউস কোট পরল। রাত্রিবেলা ঘুমোবার পক্ষে এই পোশাকটা আরামদায়ক।

সাধনা যে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়েছিলেন সেগুলো একধারে গুছিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল অফিসে যাবি তো ?'

জয়া বলল, 'যেতেই হবে। কাজের খুব প্রেসার আছে। ম্যানেজারকে অনেক ধরেটরে আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছিলাম। লিভ এক্সটেণ্ড করা যাবে না।'

ড্রেসিং টেবলের ওপর একটা মিউজিক্যাল টেবল ক্লক গীটারের মতো শব্দ করে বেজে যাচ্ছিল। এক পলক ঘড়িটা দেখে নিয়ে সাধনা বললেন, 'তা হলে আর দেরি না করে শুয়ে পড় ; সাড়ে বারোটা বাজতে চলল।' বলে আলো নিভিয়ে নিজের খাটে চলে গেলেন।

জয়া কিন্তু তক্ষুণি শুয়ে পড়ল না। অন্ধকারে নিজের খাটের একধারে বসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ সাধনা মাসী ?'

'এক দিনের। কাল থাকব, পরশু ভোরে চলে যাব।' সাধনা বললেন।

একটু ভেবে জয়া বলল, 'পরশু দিনটাও ছুটি নিয়ে নিলে না কেন? শনি-রবি তোমাদের অফ-ডে। একসঙ্গে টানা চার দিন থেকে সোমবার চলে গেলে পারতে।'

সাধনা বললেন, 'তা হলে তো ভালোই হত। ছুটি নেবার সময় এটা ভেবে দেখি নি।'

'এক কাজ করো না—'

'কী?'

'কাল পুণায় তোমার অফিসে ফোন করে পরশু দিন ছুটি নিয়ে নাও। নইলে পরশু ভোরে উঠে পুণায় যাবে, আবার তার পরের দিন বম্বে ফিরবে। শুধু শুধু ছোটাছুটি।'

সাধনা বললেন, 'ঠিক আছে, কাল একটা ফোনই করে দেব।' বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন।

জয়া কিছু বলল না টান টান হয়ে শুয়ে পায়ের দিক থেকে পাতলা চাদরটা গায়ের ওপর টেনে দিল। এই ডিসেম্বর মাসে বম্বে শহরে রাতের দিকে একটা কিছু গায়ে না জড়ালে শীত-শীত করে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ সাধনা ডাকলেন, 'জয়া—'

তাঁর গলায় দূরাগত সংকেতের মতো এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠল জয়া। আস্তে করে বলল, 'কী বলছ?'

'একটা সত্যি কথা বলব?'

'কী?

'সন্ধ্যেবেলা আমি আসতেই তোর বাবা বলল, তুই নাকি খুব সেজেটেজে কোন এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্নে গেছিস—'

সাধনা যে এই বিষয়টা কোন একসময় তুলবেন সেটা তাঁকে দেখার পর থেকেই আবছাভাবে মনে হয়েছিল। জয়ার স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল। ঈষৎ কাঁপা গলায় সে বলল, 'বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ছিল। তাই—'

জয়াকে থামিয়ে দিয়ে সাধনা বললেন, 'ওসব আমি শুনেছি।' একটু থেমে কি চিন্তা করে আবার বললেন, 'আসলে কোথায় গিয়েছিলি, তাই বল—'

জয়া উত্তর দিল না।

সাধনা বললেন, 'কি রে কথা বলছিস না যে—'

জয়া অস্পষ্ট গলায় বলল, 'বললাম তো—'

সাধনা বললেন, 'ওটা সতি না' তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ়।

জয়া চুপ করে থাকল।

আচমকা বালিশের ওপর মুখ তুলে সাধনা বললেন, 'তুই কি কাউকে ভালোবেসেছিস?

ঝোড়ো বাতাসের মতো কিছু একটা জয়ার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে দিতে থাকে। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে বলল, 'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না সাধনা মাসী। পরে তোমাকে আমি সব বলব।'

'কবে বলবি?'

'আমাকে একটু সময় দাও।'

'বেশ। কিন্তু মুখ ফুটে জানতে চাইব না, তুই নিজের থেকে বলবি।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধনা এক সময় বললেন, 'তোর মা এখনও ফোনটোন করে?'

বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মা একজন নাম-করা পোলো খেলোয়াড়কে বিয়ে করেছে। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী হিন্দু; নাম কার্নাল সিং। বম্বেতে বিরাট ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস ওঁদের; আর আছে অঢেল পয়সা। ব্যবসার কাজে বছরের ত্ব-তিন মাসই ইওরোপ আমেরিকায় ঘুরে বেড়াতে হয় ওঁদের। জয়া যেখানে কাজ করে তারা কার্নাল সিংদের ট্রাভেল এজেন্ট। মাঝে-মাঝেই এসব ব্যাপারে মা বা কার্নাল সিং নিজে জয়াকে ফোন করেন। তবে বেশির ভাগ সময় শুধু তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ওঁরা ফোন করেন। অনেক সময় নিজেরাও হুট করে তার অফিসে চলে আসেন। মানুষ হিসেবে কার্নাল সিং চমৎকার। ষাটের মতো বয়স হয়েছে তবু ভয়ানক স্মার্ট, যুবকদের মতো টগবগে। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান বলতে যা বোঝা যায়, তিনি

তা-ই। স্ত্রীর প্রথম পক্ষের মেয়ে হলেও জয়াকে তিনি খুবই স্নেহ করেন।

জয়া বলল, 'করে।'

'কী বলে?'

'তেমন কিছু না।'

সাধনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। হাতের পাতা থেকে মুখ নামিয়ে ওপাশ ফিরে শুতে শুতে বললেন, 'এবার ঘুমো'। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর গভীর শ্বাস টানার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জয়া কিন্তু ঘুমোতে পারছিল না। এক ধরনের অস্থিরতা চারদিক থেকে তাকে যেন ঘিরে ফেলছিল। এতদিন সে যা গোপন রাখতে চেয়েছে, সাধনা মাসী তা ধরে ফেলেছেন। খুব সম্ভব বাবাও। অজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তাঁরা হয়ত জানেন না। তবে জয়া কোথাও কিছু একটা করছে কিংবা মনের দিক থেকে জড়িয়ে পড়েছে, সেটা নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন। ওঁদের কাছে সব কথা কি এখনই খুলে বলা দরকার? জয়া বুঝতে পারল না।

তাদের কুড়িতলা বিশাল বাড়িটা এখন একেবারে নিঝুম। খানিকক্ষণ আগেও পাশের ফ্ল্যাটে এলসার গাঁকগাঁক চিৎকার আর কাপ-প্লেট ভাঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সে-সব এখন থেমে গেছে। তুলকালাম যুদ্ধের পর ওখানে এই মুহূর্তে হয়ত সন্ধির খসড়া লেখা হচ্ছে। ওয়ারের পরই তো ট্রিটি।

নিচে জুহু-তারা রোডে এই সময়টা দু-চারটে মাতাল হল্লা বাধায়। দেড়শো ফুট উচ্চতায় তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি পৌঁছয় না। তবে ক্বচিৎ এক-আধটা প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সির উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া কিংবা ওয়েস্টবাউণ্ড প্লেনের বাতাস চিরে চিরে আরব সাগর পার হওয়ার শব্দ ছাড়া আর সব কিছুই গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

খানিকক্ষণ একভাবে শুয়ে থাকার পর পাশ ফিরল জয়া। ঘরে অন্ধকার রয়েছে ঠিকই, তবে তেমন গাঢ় নয়। শুয়ে শুয়েই চোখে পড়ছে, আরব সাগরের মাথায় ঝকঝকে নীলাকাশের ঠিক মাঝমধ্যিখানে রুপোর থালার মতো

গোল চাঁদ স্থির আছে। এটা পূর্ণিমা পক্ষ। গলানো রুপোর মতো জ্যোৎস্নায় বাইরের সব কিছু ভেসে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল জয়া। তারপর নিজের অজান্তেই এক-সময় উঠে পড়ল। কখন যে সমুদ্রের দিকের ব্যালকনিতে সে এসে দাঁড়াল, নিজেই জানে না।

এই মধ্য রাতে বাতাসে খুব জোর নেই। ঝিরঝিরে স্রোতের মতো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। জুহু বীচের ধার ঘেঁষে যে নারকেলগাছগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে, তাদের পাতায় পাতায় মায়াবী আলোর মতো জ্যোৎস্না মাখানো রয়েছে। রুপোর দানার মতো বীচের বালি ঝিকমিক করছে, আর সমুদ্রের হাজার হাজার ঢেউয়ের মাথায় অনবরত ফসফরাস জ্বলছে। সব মিশিয়ে আশ্চর্য অলৌকিক এক ল্যাণ্ডস্কেপ।

আকাশ, সমুদ্র বা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এলোমেলো-ভাবে আজকের সারাদিনের নানা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল জয়ার। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ না; আচমকা সামনের সব দৃশ্য বা শব্দ এবং আজকের দিনটা চোখের সামনে থেকে মুছে গেল যেন। একটা জোরালো উজান স্রোত প্রবল আকর্ষণে তাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

জয়া শুনেছে তার জন্মের বছর দুই-তিন আগে শিবনাথ একটা হিন্দী ছবিতে প্লে-ব্যাক করার জন্য কলকাতা থেকে বম্বেতে এসেছিলেন। সেটা ফর্টি-ফাইভের শেষের দিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে থেমেছে।

শিবনাথ তখন ছিলেন কলকাতার দুর্দান্ত পপ সিঙ্গার। তাঁর অগুনতি ফ্যান, দারুণ পপুলারিটি। শিবনাথ নামটা খুব মডার্ন নয়, তাই ওটা বদলে 'তাপসকুমার' নামে তিনি গাইতেন। কলকাতায় তখন বাঙলা ছবি মানেই তাপসকুমারের প্লে-ব্যাক। বাজারে তাঁর রেকর্ড বেরুলে দু-দিনেই স্টক শেষ হয়ে যায়!

বম্বে এসে একটা ছবিতে প্লে-ব্যাক করেই তিনি মাত করে দিয়েছিলেন। তারপর নানা ফিল্মে গাইবার জন্য হুড়হুড় করে কনট্রাক্ট আসতে লাগল। বম্বেতে ছবি হয় কলকাতার পাঁচগুণ। এখানে স্কোপ বেশী, টাকা অঢেল, সুযোগ-সুবিধা এবং পাবলিসিটি প্রচুর। এখানকার একটা ছবি হিট করলে

রাতারাতি গোটা ইণ্ডিয়ায় নাম ছড়িয়ে যায়। সারা দেশের কাছে নিজের দাম কতটা, দু-দিনেই টের পাওয়া যায়। হোল ইণ্ডিয়া তাকে মাথায় করে নাচুক, তার রেকর্ডে বাজার ছেয়ে যাক, তার গান হোল্ কানট্রিতে অনবরত বাজতে থাকুক—কোন্ আর্টিস্ট এটা না চায়? শিবনাথ সেই যে বম্বে এসেছিলেন, আর ফিরে গেলেন না।

কলকাতায় ফেরার মতো তেমন কোন চার্মও ছিল না। মা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। তারপর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। বাবা মানুষটা এমনিতে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু দু-নম্বর স্ত্রীটি আসার পর তাঁর চালচলন, বিশেষ করে শিবনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর সৎ-মা'র যখন ছেলেমেয়ে হতে শুরু করল, একেবারেই বদলে গেলেন। শিবনাথের তখন সর্বক্ষণ মনে হত সৎ-মা আর বাবার সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো পড়ে আছেন। খেতে বসে মনে হত, তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয় নি, অথচ জোর করে পাত পেড়ে বসে গেছেন।

দু-চার বছর ঘাড়মুখ গুঁজে সৎ-মা আর বাবার ফ্যামিলিতে কাটিয়ে দেবার পর আর পারা গেল না। ছেলেবেলা থেকেই শিবনাথের মধ্যে দুটি জিনিস একটু বেশী পরিমাণেই আছে। প্রথমটা সেন্টিমেণ্ট, দ্বিতীয়টা আত্মসম্মানবোধ। কাজেই একদিন বাড়ি ছাড়তে হল। বেশ কিছুদিন রাস্তায়, ফুটপাথে, লোকের বাড়ির রোয়াকে, পার্কে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এক নামকরা ব্যারিস্টারের রক্ষিতার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন শিবনাথ।

মেয়েমানুষটির নাম ছিল বিজলী। চেহারার সঙ্গে নামের মিল হাজারে একটা হয় কিনা সন্দেহ। বিজলীর বেলায় কিন্তু হয়েছিল। আগুনের মতো গায়ের রঙ তার; নাকমুখ যেন কেটে বসানো। বয়স ছিল তিরিশ বত্রিশ; শরীরে অল্পস্বল্প মেদ জমতে শুরু করেছিল। এই সামান্য মেদ ছিল তার এক্সট্রা আকর্ষণ। তবে তার চোখ ছিল দেখবার মতো। একেবারে কান পর্যন্ত টানা। ফোলা ফোলা পাতাদুটোর নীচে ঘন কালো পালক বসানো। থুতনিতে ছিল একটা আলগা খাঁজ; গালে একটা লালচে তিল।

সারাদিন সেজেগুজে পরী হয়ে থাকতে ভালবাসতো বিজলী। পরনে থাকত মুগা আর জরির কাজ-করা চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি আর নরম তসরের ব্লাউজ। হাতে থাকত গোছা গোছা সলিড সোনার চুড়ি; গলায় সরু চেনে পান্না-বসানো পান পাতার মতো লকেট। নাকে হীরের নাকছাবি, হাতে হীরের আংটি! সেকালের ফ্যাশন ছিল পাতা কেটে চুল বাঁধা। সেইভাবেই সে চুল বাঁধত।

দু-রকমের নেশা ছিল বিজলীর। সারাদিনে খুসবুওলা জর্দা দিয়ে কম করে বিশ খিলি পান খেত সে। সন্ধ্যের পর তার বাবু হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শোভাময় গিলে-করা কলিদার পাঞ্জাবি পরে, কাঁচি ধুতি লুটিয়ে, ঝকমকে পাম্প-শু থেকে জেল্লা ছুটিয়ে, গা থেকে আতরের গন্ধ উড়িয়ে পুরো কার্তিকটি হয়ে যখন আসতেন তখন আলমারি থেকে বেরুতো হুইস্কির বোতল। শোভাময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেত বিজলী।

রাত্তিরে নেশার ঘোরে বিজলীর চোখদুটো হয়ে থাকত ঢুলুঢুলু। কিন্তু দিনের বেলা পেটে যখন মদ পড়ত না তখন সে দুটো বাজপাখির চোখের মতো দেখাতো। যেমন উগ্র তেমনি ধারালো।

দারুণ মেজাজ ছিল বিজলীর। একই সঙ্গে সে খামখেয়ালী এবং রাগী। মেজাজ চড়লে হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারত। ব্যরিস্টার শোভাময় পাকড়াশীর মুখে এবং ঘাড়ের কাছে নাকি অনেকগুলো কাটা দাগ ছিল; ওগুলো বিজলীর হাতের কাজ।

বিজলী নামে ব্যারিস্টারের এই মেয়েমানুষটির বাড়িতে চাকরের মতো ফুট-ফরমাস খাটতে হত শিবনাথকে। আরো একটি কাজ ছিল তাঁর। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে জামাকাপড় খুলে সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে সে শুতো আর তখন শিবনাথকে তার সারা গা টিপে দিতে হত। যতক্ষণ না বিজলীর ঘুম আসছে শিবনাথের থামা চলত না। ফুট-ফরমাস খাটা বা শরীর টেপার ব্যাপারে একটু এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। পান থেকে চুন খসলেই ফুলদানি কি হাত-পাখা ছুঁড়ে মারত বিজলী।

যে শিবনাথের মধ্যে আত্মসম্মান এবং সেন্টিমেন্ট এত প্রবল, তার পক্ষে

বিজলীর মতো একটি বড়লোকের রক্ষিতার কাছে একটা দিনও টিকে থাকা মুশকিল। তবু শিবনাথ তার কাছে প্রায় আট দশটা বছর কাটিয়েছে। তার একমাত্র কারণ বিজলীর গান।

বিকেল হলেই শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস গা'টি ধুয়ে, পাতা কেটে চুল বেঁধে, সেজেগুজে, গায়ে বিলিতি সেণ্ট ঢেলে হারমোনিয়াম নিয়ে বসত বিজলী। নানা রকমের গান গাইত সে। ভোলা ময়রা অ্যান্টনী ফিরিঙ্গির গান। এসব ছাড়া পদাবলী কীর্তন, ভজন, পুরনো আমলের দাশু রায়ের গান। তার ওপর সিনেমা-থিয়েটারের গান তো ছিলই। সারাদিন হাইকোর্টে গলা ফাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা বিজলীর কাছে এসে তার গলায় কোকিলের ডাক বুলবুলির শিস শুনবেন বলে অনেক কাল আগে ওস্তাদ রেখে তাকে গান শিখিয়েছিলেন শোভাময়। পরে ওস্তাদ অবশ্য ছিল না। তবে গানের রেওয়াজটা চালিয়েই যেত বিজলী।

ভারী মিষ্টি আর মন-ভুলানো ভরাট গলা ছিল তার। আশ্চর্য মোহ আর জাদু যেন মাখানো থাকত তাতে। বিজলী যখন গাইত তার গলা থেকে দানা দানা সুর ঝরতে থাকত। চোখ অর্ধেক বুজে খুব মগ্ন হয়ে সে গাইত। তার গানের সময় শোভাময় ছাড়া আর কারো কাছাকাছি থাকার হুকুম ছিল না। কিন্তু যখন সে গান ধরত অস্থির হয়ে উঠতেন শিবনাথ। জাদুকরীর মতো বিজলীর গান তাঁর রক্তমাংস ধরে টান দিয়ে নিয়ে যেত। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে শিবনাথ বিজলীর গান-বাজনার ঘরের একটা জানালার পাশে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত।

সেন্টিমেন্ট আর আত্মমর্যাদার পাশাপাশি আরো একটি ঘুমন্ত ব্যাপার ছিল শিবনাথের মধ্যে। সেটা গান। ছেলেবেলা থেকেই গান শোনার কান ছিল তাঁর। আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতাও ছিল। কোন সুর একবার শুনলেই তিনি চট করে গলায় তুলে নিতে পারতেন। বিজলীর কাছে আসার পর সে যেন শিবনাথের ভেতরকার কোন একটা বন্ধ লোহার কৌটো খুলে গানের ভ্রমরটাকে ফুসলে বার করে এনেছিল। শুধু তাই না, ক্রমাগত নিজের অজান্তে সেটাকে উস্কে যাচ্ছিল।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন শিবনাথ। সেদিন গাইতে গাইতে হঠাৎ

বাইরে পানের পিক ফেলতে এসেছিল বিজলী। রোজই পিকদান নিয়ে গাইতে বসত সে ; সেদিন কি কারণে যেন ভুলে গিয়েছিল।

বাইরে এসে জানালার কাছে থামের আড়ালে শিবনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল বিজলীর ; চোখের তারা আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠেছিল। হাতের সামনেই ছিল ছোট একটা ফুলের টব। সেটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারতে গিয়ে কি ভেবে আর মারে নি। আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে পিক ফেলে রাগী কর্কশ গলায় বলেছিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস ?'

বানিয়ে মিথ্যে বলতে পারতেন না শিবনাথ। ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, 'গান শুনছিলাম '

বিজলী এবার ক্ষেপে গিয়েছিল, 'শুয়ারের বাচ্চা, হারামী কাঁহাকা, গান শুনছিলি ! জানিস না, ব্যারিস্টার সাহেব ছাড়া আমি কাউকে গান শোনাই না ?'

মুখ নীচু করে শিবনাথ বলেছিলেন, 'জানি।'

'জেনেশুনেও এত সাহস হল তোর কি করে ?'

শিবনাথ চুপ।

বিজলী চড়া গলায় চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'ব্যারিস্টার সাহেব আমাকে এই বাড়ি করে দিয়েছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দ্যায় মাসে মাসে, গয়না দ্যায়, হীরেমুক্তো দ্যায়, মদের বোতল দ্যায়। তবে আমার গান শুনতে পায়। আর তুই একটা পা-টেপা চাকর হয়ে আমার গান শুনিস ! জুতিয়ে তোর পিঠের ছাল আমি নেব রে হারামজাদার বাচ্চা—দাঁড়া ঘোড়ার লেজের চাবুকটা নিয়ে আসি।'

বিজলী ঘুরে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ মরীয়ার মতো বলে উঠেছিলেন শিবনাথ, 'ব্যারিস্টার সাহেব যে জন্যে গান শোনে, আমি সেজন্যে শুনি না।'

কপালের মসৃণ চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যাচ্ছিল বিজলীর। চোখের মণি জ্বলছিলই। রাগে বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। তবে ভেতরে ভেতরে একটু থিতিয়ে গিয়েছিল সে। বলেছিল, 'কি জন্যে গান শুনিস ?'

'শেখার জন্যে।' মুখ না তুলেই শিবনাথ উত্তর দিয়েছিলেন।

কয়েক পলক স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বিজলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই গান জানিস ?'

'না। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে পারি না।'

'তবে ?'

'গান শুনলে গলায় তুলে নিতে পারি।'

'মিথ্যে কথা।'

'না, সত্যি।'

একটু ভেবে বিজলী এবার জানতে চেয়েছিল, 'কদ্দিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার গান শুনছিস ?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'অনেকদিন।'

'আমার ক'টা গান তুলেছিস ?'

আচমকা বিজলী দৌড়ে এসে তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে গান-বাজনার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'যে ক'টা গান তুলেছিস, সব শুনব। যদি গাইতে না পারিস, প্যান্ট খুলে ন্যাংটো করে গায়ে রেড়ির তেল মাখিয়ে চাবকাবো। তারপর লাথি মারতে মারতে বাড়ির বাইরে করে দেবো।'

শিবনাথ এ কথার কী উত্তর দেবে, সে চুপ করে ছিল। বিজলী তাকে বসিয়ে নিজে তার মুখোমুখি বসে গম্ভীর রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'এবার আরম্ভ কর।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো কয়েক সেকেণ্ড বসে ছিলেন শিবনাথ। তারপর চোখ বুজে একটার পর একটা গান গেয়ে গেছেন।

শুনতে শুনতে বিজলীর কপালের ভাঁজ মুছে গিয়েছিল, ভুরু স্বাভাবিক হয়েছিল ; চোখের দৃষ্টি ক্রমশ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অবাক বিস্ময়ে সে শুধু শিবনাথকে দেখেই যাচ্ছিল, দেখেই যাচ্ছিল।

গান শেষ হলে কোমল গলায় বিজলী বলেছিল, 'তুই তো চমৎকার গাস। গান শিখবি ?'

শিবনাথ চোখ মেলেছিলেন, 'কে শেখাবে ?'

'আমি শেখাবো।'

সত্যিসত্যিই গান শেখাতে শুরু করেছিল বিজলী। এবং সেদিন থেকেই।

তার যা কিছু জানা ছিল, টপ্পা-ঠুংরি-গজল-পুরাতনী ভক্তিগীতি—কয়েক বছরের মধ্যে সব ঢেলে দিয়েছিল শিবনাথকে। হারমোনিয়াম, সেতার বা অন্য কোন রকম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট বাজাতে জানতেন না শিবনাথ। বিজলী হাতে ধরে চার পাঁচ রকমের বাজনা তাঁকে শিখিয়েছিল। বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কি করে গাইতে হয় তার তালিমও দিয়েছিল।

এমনিতে বিজলী ছিল ভয়ানক রকমের মেজাজী, রাগী আর খামখেয়ালী। কিন্তু গান শেখাবার সময় তার বড় যত্ন, বড় মমতা। গানবাজনার জন্য তার ছিল তীব্র অথচ পবিত্র একটি প্যাসান।

গানের জন্যই খুব সম্ভব শিবনাথের ওপর বিজলীর মায়া পড়ে গিয়েছিল। তিনি যাতে এই লাইনে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য সে শোভাময়কে খুব ধরেছিল।

বিজলীর বাবু শোভাময় গান-বাজনা দারুণ ভালবাসতেন। ভূপাল থেকে, ইন্দোর থেকে, লক্ষ্ণৌ কি পুণা থেকে বড় বড় ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্ট আনিয়ে সেকালের কলকাতায় যে গানের আসর বসানো হত, তিনি ছিলেন তার একজন বড় পেট্রন। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকই না, লাইট মিউজিকও তিনি পছন্দ করতেন। উচ্চাঙ্গই হোক, আধুনিকই হোক, গান-বাজনার সব ব্যাপারেই ছিল তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। তখনকার দিনে লাইট মিউজিকের যে জলসা-টলসা হত তিনি তার কোনটার প্রেসিডেণ্ট, কোনটার সেক্রেটারি।

খুবই বড় মনের মানুষ ছিলেন শোভাময়। তার ওপর বেজায় ফুর্তিবাজ। এক চোখ টিপে শিবনাথের সামনেই তিনি বিজলীকে বলেছিলেন, 'কি ব্যাপার গো চাঁদবদনী, ওই ছোকরাকে নিয়ে যেভাবে লেগেছ, আমার বোধ হয় স্ট্রোক হয়ে যাবে।'

কপাল কুঁচকে বিজলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'মানে?'

'মানেটা জলের মতো। ছোকরাকে এতদিন গান শেখালে, এখন আমাকে বলছ তার জন্যে রেডিওতে জলসায় চান্স করে দিতে। এর পর বলবে রেকর্ড কোম্পানিকে দিয়ে ডিস্ক বার করতে। যেভাবে ওর দিকে তোমার টান বাড়ছে, একদিন হয়ত দেখব মেন লাইন থেকে আমাকে হটিয়ে ছোকরা ইন করে গেছে। বুড়ো বয়েসে এই দাগাটা দেবে চন্দ্রমুখী!' বলে আদরের ভঙ্গিতে বিজলীর নাকের ডগায় আলতো করে টুসকি মেরেছিলেন।

বিজলীর চোখের তারায় আগুনের ফুলকি দেখা দিয়েছিল। ধাঁ করে পাশের টেবল থেকে একটা পেতলের ফুলদানি তুলে নিয়েছিল সে।

চোখের পলকে এ ঘরের এক কোণে সরে গিয়েছিলেন শোভাময়। তত-ক্ষণে বিজলী টিপ করে ফুলদানিটা ছুঁড়ে মেরেছিল। ক্রিকেট মাঠের পাকা ফিল্ডারের মতো সেটা লুফে নিয়েছিলেন শোভাময়। বারো চোদ্দ বছর ধরে বিজলীকে তিনি রেখেছেন। এত কাল বিজলী ফুলদানি-টুলদানি ছুঁড়ে এসেছে এবং তিনিও লুফে এসেছেন। প্রথম দিকে নিশ্চয়ই আনাড়ী ছিলেন; ক্যাচ লুফে লুফে শেষ পর্যন্ত ওস্তাদ ফিল্ডার হয়ে গিয়েছিলেন।

ফুলদানিটা হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে জিভের ডগায় চুকচুক করে একটু শব্দ করেছিলেন শোভাময়। বলেছিলেন, 'আরেকটু হলেই আমার মাথাটা ফাটত।'

নিশানায় লাগাতে না পেরে বিজলী ক্ষেপে গিয়েছিল। সট করে টেবল থেকে এবার একটা অ্যাশ-ট্রে তুলে নিয়েছিল সে। ছুঁড়বার আগেই শোভাময় দু-হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা—ক্ষমা—'

বিজলী অ্যাশ-ট্রেটা নামিয়ে রেখে হেসে ফেলেছিল, 'ঠিক আছে, ক্ষমা করলাম।' সত্যিসত্যিই শোভাময়কে গভীরভাবে ভালবাসত সে। রুচিটাও ছিল তার অত্যন্ত মার্জিত। নোংরা ঠাট্টা-ইয়ার্কি একেবারেই পছন্দ করত না। তা ছাড়া পলকে যেমন তার মেজাজ চড়ে যেত তেমনি চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই আবার সেটা জলও হয়ে যেত।

'বাঁচালে বাবা—' ঘরের কোণ থেকে সরে এসে বিজলীর কাঁধে একটা হাত রেখে সোফায় গিয়ে বসেছিলেন শোভাময়।

বিজলী বলেছিল, 'খুব তো সোহাগ হচ্ছে। শিবের কী হবে?'

শোভাময় রগড় করে বলেছিলেন, 'চন্দ্রাননে, তুমি যখন হুকুম করেছ, সব হবে।' শিবনাথের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'দারুণ একখানা 'লাক' করে এসেছিলি রে হারামজাদা। লাইফে' যদি কোনদিন সত্যি সত্যি দাঁড়াতে পারিস এই মহিলাটিকে মনে রাখিস।' রক্ষিতা হলেও বিজলীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন শোভাময়।

যাই হোক, বিজলীর কথাতেই জলসায় আর রেডিওতে শিবনাথের গাওয়ার

সুযোগ করে দিয়েছিলেন শোভাময়। বিজলীর কাছ থেকে খাঁটি জিনিসই পেয়েছিলেন শিবনাথ। তার ওপর ছিল তাঁর নিজস্ব রেওয়াজী গলা। দু-এক বছরের মধ্যেই নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর। ভালো পয়সাও আসছিল। এতে তিনি যত খুশী, তার দশগুণ আনন্দ পেয়েছিল বিজলী। নিজের তৈরি প্রোডাক্ট বাজারে চড়া দামে বিকোতে দেখলে কার না আনন্দ হয়।

নাম বা পয়সা আসতে শুরু করলেও বিজলীকে ছেড়ে যান নি শিবনাথ; তার কাছে থাকতেন। বিজলী ছিল তাঁর গানের গুরু। খুব ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছিলেন। মায়ের মুখ ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ত না শিবনাথের। বাড়িতে মা-বাবার বিয়ের সময়কার পুরনো হলদেটে একটা ফোটো ছিল। সেটাই তাঁর শেষ স্মৃতি। দু নম্বর বিয়ের পর ফোটোটা বাবা কোথায় সরিয়ে ফেলেছিল, কে জানে। সারা বাড়ি তোলপাড় করেও ফোটোটা খুঁজে পান নি শিবনাথ। পরে বিজলীর কাছে আসার পর মায়ের কথা মনে করতে গেলেই বিজলীর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠত।

গানের স্কোপ পাবার দু-তিন বছরের মধ্যেই বাজারে রেকর্ড বেরিয়ে গিয়েছিল শিবনাথের। তারও এক বছর পর সিনেমায় প্লে-ব্যাক করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সিনেমা-হলে বসে নায়কের গলায় তাঁর গান শুনে যেতে পারে নি বিজলী। ছবিটা রিলিজ করার দু মাস আগে দশ দিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল।

মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না শিবনাথের। তখন তাঁর বয়স মোটে চার কি পাঁচ। বিজলীর মৃত্যুর পর সেই প্রথম তিনি অনুভব করেছিলেন, এতদিনে মাতৃহীন হয়েছেন।

অবুঝ শিশুর মতো বিজলীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন শিবনাথ। বিজলীর ক্লাসের মেয়েমানুষদের আপনজন বলতে কেউ থাকে না। শ্মশানে গিয়ে পেটের ছেলের মতো তার মুখাগ্নি করেছিলেন শিবনাথ। পুরো তেরো দিন গলায় ধড়া নিয়ে অশৌচের সাজ পরে হবিষ্যি থেকে শুরু করে পুরুত ডাকিয়ে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করিয়েছিলেন। সন্তানের যা যা করণীয়, কিছুই তিনি বাদ দ্যান নি। বদমেজাজ, রাগ, গালাগাল, হাতের সামনে যা কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মারা, মদ্যপান, যত্ন, মমতা, মায়া—টুকরো টুকরো এইসব স্মৃতি দিয়ে

বানানো বিজলীর একটি পোর্ট্রেট আজীবন বুকের ভেতর আঁকা হয়ে আছে শিবনাথের।

শোভাময়ও বিজলীর মৃত্যুতে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। তার মৃতদেহের পাশে স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে থেকেছেন; চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়েছে। হৃদয়বান ফুর্তিবাজ মানুষটি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রাদ্ধ চুকে যাবার পর এ বাড়িতে আর ভাল লাগছিল না শিবনাথের। যদিও বাড়িটা বিজলীর নামে, আসলে মালিক শোভাময়ই। রক্ষিতার মৃত্যুর পর তার আশ্রিতের পক্ষে তারই বাবুর বাড়িতে থাকাটা ভালো দেখায় না। অবশ্য শোভাময় মানুষ হিসেবে চমৎকার এবং শিবনাথের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবু অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। একদিন সোজা শোভাময়ের কাছে গিয়ে মুখ নীচু করে তিনি বলেছিলেন, 'এবার আমি কী করব?' বিজলীর বাড়িতে থাকবেন কিনা, তাঁর কথায় তারই ইঙ্গিত ছিল।

শোভাময় বলেছিলেন, 'বিজলী তোকে খুব ভালবাসত। ইচ্ছে করলে তুই এ বাড়িতে থাকতে পারিস। আমার আপত্তি নেই।'

শিবনাথ চুপ করে ছিলেন।

শোভাময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হল রে?'

শিবনাথ এবার বলেছিলেন, 'মা নেই। আমার এখানে খুব খারাপ লাগছে। অনুমতি করুন, আমি চলে যাই।' সেই প্রথম বিজলী সম্পর্কে 'মা' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন।

স্থির চোখে এক পলক শিবনাথের দিকে তাকিয়ে থেকে শোভাময় বলেছিলেন, 'তোর যা ভালো মনে হয়—কর।'

পরের দিনই নিজের যা কিছু ছিল সব একটা বড় স্যুটকেসে পুরে মির্জাপুর স্ট্রীটের এক হোটেলে চলে এসেছিলেন শিবনাথ। সেখানে বছর দুই কাটবার পর বোম্বাইয়ের এক ফিল্ম কোম্পানি তাঁর সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছিল। ঠিক হয়েছিল শিবনাথ বোম্বাইতে গিয়ে প্লে-ব্যাক করে আসবেন। কিন্তু প্লে-ব্যাক করতে এসে বোম্বাই থেকে তাঁর আর ফেরা হয় নি। এখানেই থেকে যেতে হয়েছিল।

বোম্বাইতে শিবনাথ উঠেছিলেন দাদার রেল স্টেশনের কাছে এক

হোটেলে। তাঁর গাওয়া প্রথম হিন্দী ছবির গান হিট করার পর কনট্রাক্টের পর কনট্রাক্ট আসতে শুরু করেছিল। বাজারে তাঁর ফিল্মী গানের রেকর্ড তো বেরুচ্ছিলই ; রঙীন পপ ম্যাগাজিনগুলোতে তাঁর ইন্টারভিউ আর ছবিও ছাপা হচ্ছিল। বোম্বাইতে, শুধু বোম্বাইতে কেন, কয়েক বছরের মধ্যে হোল ইণ্ডিয়ায় তিনি সব চাইতে পপুলার গায়ক।

ততদিন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বম্বেকে অনেক আগে থেকেই বলা হত 'ওয়েস্টার্ন সিটি অফ ইণ্ডিয়া'। ইণ্ডিপেনডেন্সের পর সেখানে পুরোপুরি পশ্চিমী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। ইংরেজি তখন থেকে ওখানকার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। 'মড' পোশাক, ফ্রী মিক্সিং, গাদা গাদা বিয়ার শপ, যুবক-যুবতীদের ড্রাগ এ্যাডিকশান—সব মিলিয়ে বম্বে যেন ভারতবর্ষের কোন অংশ না ; অতি দ্রুত এই শহর চালচলন এবং চরিত্রে ইওরোপ বা আমেরিকার একটি মেট্রোপোলিস হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

এখানকার সব কিছুই যখন ওয়েস্টার্ন তখন গান-বাজনাতেও তার ইনফ্লুয়েন্স তো পড়বেই। সেই সময় থেকে বোম্বাইতে পপ সিঙ্গারদের নিয়ে জলসা বসানো হতো। এইসব জলসাতে দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন শিবনাথ। এমনিতেই তিনি দুর্দান্ত সুপুরুষ ; ইংরেজিতে যাকে বলে 'ম্যানলি', ঠিক তাই। তার ওপর অডিয়েন্সকে কি করে চার্ম করে রাখতে হয় সেই ম্যাজিকটা তাঁর হাতের মুঠোয় ছিল। শিবনাথ করতেন কি, সেই আমলের সবচাইতে মড পোশাক– অর্থাৎ ষাট ইঞ্চি ঘেরের ট্রাউজার, আর নামাবলীর কিংবা খবরের কাগজের ছাপ মারা বুকখোলা অদ্ভুত ডিজাইনের শার্ট, আট ইঞ্চি সোলের জুতো, প্রকাণ্ড গোল চশমা পরে হাতে মাইক নিয়ে ডায়াসের ওপর কখনও লাফিয়ে, কখনও নেচে, কখনও প্রায় ডিগবাজি খেয়ে গাইতেন। গাইতে গাইতে অডিয়েন্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতেন, 'হাই—কাম অন, জয়েন মী প্লীজ —মুহূর্তে গোটা 'শো' তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসত। কাগজগুলো তাঁর সম্বন্ধে লিখত, 'মিউজিক ওয়ার্ল্ডের বেস্ট শো-ম্যান।'

শিবনাথ যখন হলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গাইবার জন্য ডাকতেন, কেউ উঠে আসত না। তবে অনবরত হাততালি দিয়ে তাঁর শো-ম্যানশিপকে তারিফ করে যেত।

এই রকম এক গানের ফাংশানে চন্দ্রার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল শিবনাথের। গাইতে গাইতে যখন তিনি অডিয়েন্সের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'এনিবডি, প্লীজ জয়েন মী—' আচমকা সামনের দিকের একটা সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল চন্দ্রা। দারুণ 'মড' মেয়ে সে। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার, চোখে অদ্ভুত চেহারার কালার গ্লাস। খুব সহজভাবে ডায়াসে উঠে এসে আরেকটা মাইক নিয়ে শিবনাথের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর গিভিং মী অ্যান অপরচুনিটি টু সিং অ্যাণ্ড ডান্স উইথ ইউ।'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'ইটস প্লেজার টু হ্যাভ ইউ অ্যাজ পার্টনার। ইয়াং লেডি, ইওর নেম প্লীজ—'

'চন্দ্রা মালকানি—'

'ফাইন।' বলেই মাইকটা মুখের কাছে এনে শিবনাথ বলেছিলেন, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, লেট মী ইনট্রোডিউস ইউ মাই ডিলেকটেবল পার্টনার। শী ইজ চন্দ্রা মালকানি। থ্যাঙ্ক ইউ এভরিবডি। লেটস স্টার্ট—' বম্বেতে থাকতে থাকতে ইংরেজিটা জলের মতো বলতে শিখেছিলেন তিনি।

এর পর শুরু হয়েছিল গান ; সেই সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে শরীর দোলানো। মিউজক হ্যাণ্ডরা ডায়াসের পেছনে দাঁড়িয়ে নাচ এবং গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বঙ্গো, ম্যাণ্ডোলিন, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি ইত্যাদি চড়া সুরে বাজিয়ে যাচ্ছিল।

চন্দ্রার গলা খুব একটা ভালো ছিল না। তবে ফ্লোর ড্যান্সটা সে চমৎকার জানতো। ভালো গাইতে না পারলেও সেটা সে পুষিয়ে দিচ্ছিল সারা শরীরে ওয়েস্টার্ন ড্যান্সের মুদ্রা ফুটিয়ে।

এভাবে অডিয়েন্সের ভেতর থেকে কাউকে পার্টনার করে শিবনাথের আগে আর কেউ বম্বে সিটিতে ফাংশান করে নি। দর্শকরা থেকে থেকেই হুল্লোড় বাধিয়ে মাতালের মতো চিৎকার করছিল আর হাততালি দিয়ে যাচ্ছিল। ফাংশানের পর অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে যুবক-যুবতীরা তাঁকে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছিল। ফুলের তোড়ায় তোড়ায় তারা শিবনাথকে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল।

শুধু শিবনাথই নন, তার পার্টনার হিসেবে চন্দ্রাকেও প্রচুর অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। ফুলের তোড়া আর কনগ্র্যাচুলেশানস সে-ও কম পায় নি। তখন

চন্দ্রার বয়স কুড়ি-বাইশ। আচমকা একটি অল্পবয়সের মেয়ে এত অভিনন্দন-টভিনন্দন পেয়ে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তার ভালোও লাগছিল খুব। ভিড় একটু কমলে শিবনাথকে বলেছিল, 'এ সব আপনার জন্যে! আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ ' তার চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল।

শিবনাথ বলেছিলেন, 'আমার জন্যে কিচ্ছু না। আপনার ক্রেডিটেই পেয়েছেন। ব্রিলিয়ান্ট পারফর্মেন্স হয়েছে আপনার।'

'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের কথা আমি কোনদিন ভুলব না। ইটস এ মেমোরেবল নাইট ফর মী।'

'আমার পক্ষেও।'

চন্দ্রা এবার বলেছিল, 'আবার কবে দেখা হবে ?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'এনি ডে—'

'আপনি কোথায় থাকেন ?'

শিবনাথ তাঁর হোটেলের ঠিকানা দিয়েছিলেন, এবং ফোন নাম্বারও।

চন্দ্রা বলেছিল, 'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে কি নামিয়ে দিয়ে যাব ?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'ধন্যবাদ। তার দরকার নেই।' আসলে নতুন ধরনের একটা স্টান্ট বা চমক দেবার জন্য তিনি চন্দ্রাকে ডায়াসে ডেকে নিয়েছিলেন। ফাংশানের পর তার সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট আর কেরিয়ার ছাড়া তখন আর কিছু বুঝতেন না শিবনাথ। তা ছাড়া চন্দ্রার গাড়িতে যে লিফট নেন নি তার একটা কারণও ছিল। ফাংশানের অর্গানাইজারদের সঙ্গে আগে থেকেই কথা হয়েছিল, তারা তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।

চন্দ্রা বলেছিল, 'আচ্ছা, গুড নাইট—'

'গুড নাইট।'

দিন কয়েক বাদে বম্বের পপ ম্যাগাজিনগুলোতে আর খবরের কাগজে গান-বাজনার জন্য নির্দিষ্ট পাতায় সেদিনের সেই ফাংশানের উচ্ছ্বসিত রিপোর্ট বেরিয়েছিল। সেই সঙ্গে শিবনাথ এবং চন্দ্রার ছবি। কখন কাগজের

ফোটোগ্রাফাররা ছবি তুলেছিল টের পাওয়া যায় নি। মোট কথা সেদিনের ফাংশানটা বম্বে সিটিতে ঢেউ তুলে দিয়েছিল।

ছবি আর রিপোর্ট বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর হোটেলে নিজের ঘরের জানালার ধারে বসে শিবনাথ চা খাচ্ছেন, একটা লেটেস্ট মডেলের ইমপোর্টেড আমেরিকান গাড়ি এসে সামনের রাস্তায় পার্ক করেছিল। দরজা খুলে যে নেমে এসেছিল সেই মুহূর্তে তার কথা ভাবছিলেন না শিবনাথ। আসলে সেদিন ফাংশানের পর হোটেলে ফিরে আসতে আসতে চন্দ্রা মালকানিকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর আর তার কথা মনে পড়ে নি।

চন্দ্রার হাতে ছিল বেশ বড় আকারের ফ্যাশনেবল লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তেতলার জানালায় শিবনাথকে দেখে সে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'হাই—'

চন্দ্রা ঠিকানা নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সত্যি সত্যিই যে হোটেল পর্যন্ত চলে আসবে, এতটা ভাবতে পারেন নি শিবনাথ তিনি অবাক হয়েছিলেন, এবং খুশীও। মানুষ হিসেবে যে যতই প্রফেশানাল হোক, সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর আচমকা একটা সুন্দরী মড মেয়েকে দেখলে কে আর খুশি না হয়। শিবনাথ ওপর থেকে হাত নেড়েছিলেন, 'হাই— '

চন্দ্রা এবার বলেছিল, 'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি ? ওপরে যেতে বলবেন না ?'

শিবনাথ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন, 'আসুন আসুন। ওই যে ডান দিকে এনট্রান্স। ভেতরে ঢুকেই 'রিসেপশান' দেখতে পাবেন ; তার পাশ দিয়ে স্টেয়ার—'

দু মিনিটের মধ্যে চন্দ্রা তেতলায় শিবনাথের ঘরে চলে এসেছিল। শিবনাথ বলেছিলেন, ওয়েলকাম টু গরিবখানা—'

শিবনাথের ঘরটা বেশ বড়ই। চারদিকে রেকর্ডের স্তূপ। এ ছাড়া রয়েছে রেকর্ড প্লেয়ার, স্টিরিও টেপ রেকর্ডার। তা ছাড়া রয়েছে তানপুরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি। শর্ট-ট্রাউজার-টাই-মোজা—সব এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। এরই মধ্যে একধারে একটা সিঙ্গল বেড কট, আরেক পাশে

গোটা দুই সোফা। আরেক কোণে একটা ওয়ার্ডরোব; তার পাল্লা হাঁ হয়ে ছিল। ওয়ার্ডরোবের পাশে ড্রেসিং টেবল। তার ওপর নানা রকম কসমেটিকসের সঙ্গে শেভিং বক্স।

সোফায় বসতে বসতে চন্দ্রা বলেছিল, 'তিন-চার দিন ধরে ভাবছিলাম আপনার হোটেলে চলে আসব। একটা না একটা প্রবলেম এসে যাচ্ছিল। আজ সকালে উঠে ঠিক করে ফেললাম আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেবই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

শিবনাথ বললেন, 'মোস্ট প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ। আমার খুব ভালো লাগছে।'

'বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলছেন। হাইপারবোল!'

'একেবারেই না। ইটস প্লেন ট্রুথ। এর চাইতে সত্যি কথা আমি আমার লাইফে আর কখনও বলি নি।'

'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

একটু চুপ। তারপর চন্দ্রা আবার বলেছিল, 'জানেন, আপনি কী কাণ্ড করে বসেছেন?'

'কী?' চন্দ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিবনাথ। 'কি রকম?'

হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে খবরের কাগজ আর পপ ম্যাগাজিনের গাদা গাদা ক্লিপিং বার করে দেখিয়েছিল চন্দ্রা। সেদিনের ফাংশানের রিপোর্ট এবং শিবনাথ আর চন্দ্রার ছবি সেই ক্লিপিংগুলোতে ছিল। চন্দ্রা বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আমার ছবি বেরুবার পর রোজ কত ফোন যে আসছে! আই ফীল প্রাউড।'

শিবনাথ আর কী বলবেন, অল্প হেসেছিলেন।

এর পর এলোমেলো একটানা কথা বলে গিয়েছিল চন্দ্রা। সে সবের বিশেষ কোন মানে হয় না। মুগ্ধ 'ফ্যানে'দের কথায় যা থাকে তা হলো বীয়ারের ফেনার মতো উচ্ছ্বাস।

ঘণ্টা-দুই বকবকানির পর সেদিন চলে গিয়েছিল চন্দ্রা। যাবার সময় বলেছিল, 'আমি কিন্তু দুমদাম আপনার হোটেলে চলে আসব।'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'মোস্ট ওয়েলকাম।'

'আরেকটা কথা।'

'বলুন।'

'আই লাইক টু কাম ক্লোজ। 'আপনি' 'টাপনি' করে বলতে ভীষণ খারাপ লাগছে। এখন থেকে আমরা 'তুমি' করে বলব। ও-কে?'

শিবনাথ মনে মনে ভেবেছিলেন, মেয়েটা ফেঁসেছে। হেসে হেসে বলেছিলেন, 'অ্যাজ ইউ লাইক।'

সেই ফাংশানের পর বম্বে শহরে মিউজিক্যাল সয়রীর হুজুক পড়ে গিয়েছিল। এ শহর কোন একটা চমকের জন্য যেন সব সময় ঘাড়ের বগ টান করে বসে আছে! তেমন কিছু ঘটলে তাই নিয়ে উন্মাদের মতো মাতামাতি শুরু হয়ে যায়।

যেহেতু শিবনাথ একটা সেনসেসন এনেছেন সে জন্য যত ফাংশান হতো সবগুলোতেই অর্গানাইজাররা তাঁকে টেনে নিয়ে যেত। আর অনিবার্যভাবেই প্রত্যেকটা ফাংশানে চন্দ্রাকে দেখা যেত। শিবনাথ যখন মাইক হাতে নিয়ে গাইতে গাইতে অডিয়েন্সের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতেন, 'কাম অন এনিবডি অর এভরিবডি, অ্যাণ্ড প্লীজ জয়েন মী—' তখন কেউ উঠবার আগেই চন্দ্রা চোখের পলকে ডায়াসে চলে আসত। তারপর দর্শকদের উন্মত্ত চিৎকার আর হুল্লোড়ের মধ্যে ফাংশান শেষ হত। তারও পর ম্যাগাজিনে আর খবরের কাগজে ছবি আর রিপোর্ট বেরুতো। এইভাবে শিবনাথ আর চন্দ্রা গানের ফাংশানে 'মোস্ট পপুলার পেয়ার' হয়ে উঠেছিল।

গানের আসরে তো দেখা হচ্ছিলই। তা ছাড়া চন্দ্রা প্রায় রোজই শিবনাথের কাছে চলে আসত। যেদিন তাঁর প্লে-ব্যাক রেকডিং থাকত সেদিন তারদেও-এর স্কোরিং-এ চলে যেত। শিবনাথের প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল চন্দ্রা এবং দুজনে পরস্পরের অনেক কাছাকাছিও চলে এসেছিল।

ততদিনে চন্দ্রাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনে গিয়েছেন শিবনাথ। ওর বাবা একজন মাল্টি-মিলিওনের। বম্বের অনেক কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার ছিল। তা ছাড়া ছিল বিরাট এক্সপোর্ট বিজনেস। ইণ্ডিয়া থেকে সে-আমলে আফ্রিকায় যত রেডিমেড গারমেন্ট যেত তার সিকি ভাগ পাঠাত চন্দ্রারা।

তখনও দেশ ভাগ হয় নি। করাচীতে ওদের তিন পুরুষের শিপিং বিজনেসও ছিল।

চন্দ্রারা দুই ভাই, দুই বোন। ভাইবোনদের মধ্যে চন্দ্রা সবার ছোট। মহালছমীতে পুরনো আমলের প্রাসাদের মতো গথিক স্ট্রাকচারের বিরাট একটা বাড়ি ছিল ওদের; আর মালাবার হিলসে ছিল ফ্যাশনেবল বাংলো। গাড়ি ছিল গণ্ডা গণ্ডা। শাড়ি বা স্ল্যাকস পালটাবার মতো রোজ একটা করে নতুন গাড়ি নিয়ে শিবনাথের হোটেলে আসত সে।

একদিন শিবনাথের গান রেকর্ডিং ছিল না, গানের ফাংশানও ছিল না। ভেবেছিলেন গোটা দিনটা ঘুমিয়ে-টুমিয়ে অলস মেজাজে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু দুপুরবেলা হঠাৎ চন্দ্রা এল এবং একরকম জোরজার করে শিবনাথকে তার গাড়িতে তুলে সোজা ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে সমুদ্রের ধারে এসে থামলো। জলের পাড় ঘেঁষে পাশাপাশি বসে চন্দ্রা বলেছিল, 'আমি ডিসিসান নিয়েছি।'

'কিসের ডিসিসান?' শিবনাথ চন্দ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে চন্দ্রা বলেছিল, 'তোমাকে ছাড়া আমার একদম ভালো লাগছে না। আই অ্যাম ফিলিং অ্যাবসোলিউটলি লোনলি।'

'কী চাও তুমি?'

'বুঝতে পারছ না?'

শিবনাথ উত্তর না দিয়ে তাকিয়েই ছিলেন। চন্দ্রা তাঁর নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে বলেছিল, 'বিয়ে করতে।'

শিবনাথ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তোমাদের বাড়িতে এ বিয়ে মেনে নেবে?'

'বিয়ে তো করব আমরা। কে মানবে আর কে মানবে না, তা নিয়ে আমার হেড-এক নেই। তবে মা-বাবাকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। দ্যাটস কার্টসি।' বলে একটু থেমে চন্দ্রা পরক্ষণে আবার শুরু করেছিল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছ?'

দ্বিধার ভঙ্গিতে শিবনাথ বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'বল—'

'এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন?'

'তোমরা এত বড়লোক, আর আমি সেই তুলনায় এত—'

শিবনাথ তাঁর কথা শেষ করতে পারেন নি। তার আগেই চন্দ্রা বলে উঠেছিল, 'এত গরিব যে এ বিয়ে ইমপসিবল্, তাই তো? এই রটন ডায়লগটা ফিল্মে শুনে শুনে কান পচে গেছে। ওটা নিয়ে ডোণ্ট সোয়েট ইওর ব্রেন। কাল বিকেলে কী করছ?

পরের দিনও শিবনাথের গান রেকর্ডিং বা ফাংশান ছিল না। বলেছিলেন, 'কিছু না।'

'ফাইন। কাল কোন প্রোগ্রাম রেখো না।'

'কেন?'

'তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'কালই দেখতে পাবে।'

পরের দিন চন্দ্রা মালাবার হিলে তাদের প্রকাণ্ড ফ্যাশনেবল বাংলোয় শিবনাথকে নিয়ে গিয়েছিল। সবুজ কার্পেটের মতো লনে গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বসে তার মালটিমিলিওনেয়ার বাবা চম্পালাল মালকানি, মা প্রেমাবতী মালকানি, দুই দাদা ময়ূর আর মাধব এবং এক দিদি মৃদুলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর চম্পালালের দিকে ফিরে বলেছিল, 'আমরা তোমার ব্লেসিং চাই বাবা। উই ওয়াণ্ট টু ম্যারি।'

'চন্দ্রাদের বাংলোর তলা থেকে আরব সাগর শুরু হয়েছে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছিল। তবু চম্পালালের সামনে বসে গলগল করে ঘেমে যাচ্ছিলেন শিবনাথ। নার্ভাসনেস!

চম্পলাল কিন্তু উত্তেজিত হন নি। আরামদায়ক বেতের সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সহৃদয় ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। গান গেয়ে এভারেজে মান্থলি তোমার কত হয়?'

অস্পষ্ট গলায় শিবনাথ বলেছিলেন, 'দু হাজারের মতো।'

'আই সী, আই সী'। তা হলে তোমাকে পরামর্শ দেব, ডোণ্ট ইনভাইট সাফারিং। আমার মেয়ে, আই মীন চন্দ্রা, মাসে কসমেটিকস আর শাড়ি-স্ল্যাকসই কেনে দু হাজার টাকার। অনেস্টলি বলছি, তোমার নাম দেখে, গ্ল্যামার দেখে হুইমসের মাথায় বিয়ে করতে চাইছে। পরে তুমি বিপদে পড়ে যাবে: আই নো মাই ডটার প্রেটি ওয়েল।' বলেই চম্পালাল মালকানি চন্দ্রার দিকে ফিরেছিলেন, 'ডোণ্ট ইনভাইট সরো চন্দ্রা —'

চন্দ্রা জেদের গলায় বলেছিল, 'মোটেও আমি হুইমসের মাথায় বিয়েটা করতে যাচ্ছি না।'

'ভালো করে ভেবে ছাখো।'

'আই অ্যাম সাফিসিয়েণ্টলি গ্রোন-আপ। অনেক ভেবেই ডিসিনান নিয়েছি।'

চম্পালাল বুঝেছিলেন, এ বিয়ে আটকানো যাবে না। একটু ভেবে বলে-ছিলেন, 'শিবনাথের যা ইনকাম তাতে সংসার চলে না। বিয়ের পর আমাকে কত সাবসিডি দিতে হবে?'

শুনে কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছিল শিবনাথের। একবার ভেবেছিলেন উঠে চলে যান, কিন্তু পেরেকে ঠুকে কেউ যেন তার পা দুটো লনের মাটিতে আটকে দিয়েছিল।

যাই হোক চন্দ্রাই সেদিন শিবনাথের সম্মান বাঁচিয়ে দিয়েছে, 'বিয়ের পর তোমার পয়সা নেব কেন?'

'গুড, ইয়ং লেডি। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইওর স্পিরিট। তবে আজকের এই কথাটা যেন মনে থাকে।'

'ডেফিনিটলি থাকবে।'

এর কয়েকদিন বাদে বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। মালাবার হিলে চম্পালাল মালকানির সঙ্গে আলাপ হবার পরও শিবনাথ আপত্তি যে করেন নি, তা নয়। কিন্তু আপত্তিটা তেমন জোরালো ছিল না। আসলে চন্দ্রার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল, সব কিছু আচ্ছন্ন করে দেবার মতো এমন একটা প্রবল ক্ষমতা, তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আরব সাগরের একরোখা দমকা বাতাসের মতো একদিন সে এসেছিল তাঁর কাছে, তারপর দুর্বল পাতার মতো তাঁকে উড়িয়ে

নিয়ে গিয়েছিল। তবে গোপনে, মনে মনে শিবনাথ এটাই তো চেয়েছিলেন। তাঁর যেটুকু আপত্তি তা সংস্কার মাত্র ; জন্মের পর থেকে গরিব বা মধ্যবিত্তের রক্তে ওটা থেকেই যায়।

বিয়ের পর হোটেল ছেড়ে চন্দ্রাকে নিয়ে সামনের একটা বড় ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলেন শিবনাথ ! এই সময়টা তাঁর জীবনের গোল্ডেন পিরিয়ড। নাম, পয়সা, গ্ল্যামার— সব হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সামনে তাঁদের বাড়ির উল্টো দিকে, ঠিক মুখোমুখি, ছিল টানা একটা বস্তি ; বম্বেতে বলে 'চাওল'। তখন প্রায় রোজই গান রেকর্ডিং-এর জন্য সকালে উঠে তারদেওতে যেতে হত শিবনাথকে। ফিল্ম কোম্পানির গাড়িতে উঠতে গিয়ে রোজই দেখতেন 'চাওলে'র সদর দরজায় পাতলা ছিপছিপে সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছে। মেয়েটির চোখে বিস্ময়, মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি। রোজই শিবনাথের মনে হত, মেয়েটি তাঁকে কিছু বলতে চায় !

একদিন গাড়িতে উঠতে গিয়েও উঠলেন না শিবনাথ। রাস্তা পেরিয়ে 'চাওলে'র দরজায় চলে এলেন। বললেন, 'আমাকে কিছু বলবেন ?'

মেয়েটি একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তবে খুশীও হয়েছিল খুব ; সেটা বোঝা গিয়েছিল তার চোখমুখের ঝকমকানি দেখে। মেয়েটি লাজুক হেসে বলেছিল, আপনার গান আমার ভীষণ ভালো লাগে। আলাপ করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সাহস পাই না।'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'আপনার কী নাম ?'

'সাধনা—সাধনা পূনেকর ! আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'ঠিক আছে।' শিবনাথ হেসেছিলেন, 'তোমরা এ বাড়িতে থাকো ?'

'হ্যাঁ।' সাধনা আস্তে মাথা হেলিয়েছিল।

'আজ আমি খুব ব্যস্ত। এখুনি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। বলতে পারছি না। পরশু দিন বিকেলে আমার কোন কাজ নেই। ইচ্ছে হলে আমাদের ওখানে আসতে পারো। অনেক গল্প করা যাবে। তেতলার উঠে ছ' নম্বর ফ্ল্যাট।

'আমি জানি।'

কথামতো পরদিনই এসেছিল সাধনা। কলিং বেল টিপতে শিবনাথই দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে নিয়ে একটা সোফা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বোসো—'

জড়সড় হয়ে বসে পড়েছিল সাধনা। চন্দ্রাকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন শিবনাথ।

সেই যে এসেছিল, তারপর থেকে সাধনা প্রায়ই আসত। শিবনাথ কবে কোন্ রেকর্ড করেছেন, কোন কোন ফাংশানে গেয়ে সেনসেসন এনেছেন, সব তার মুখস্থ। শিবনাথের দুর্দান্ত ফ্যান সে। তার সম্পর্কেও অনেক কথা জেনেছিলেন শিবনাথ। ওরা মারাঠী ব্রাহ্মণ ; সামনের ওই 'চাওলে' থাকে। বাবা নেই, মা আছে। আর আছে ছোট ছোট পাঁচটি ভাইবোন। সাধনা সবার বড়। গত বছর বি-এ পাস করেছে। সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য তাকে চাকরি নিতে হয়েছে। টাটাদের কী একটা ফার্মে তখন স্টেনো-গ্রাফার-কাম-টাইপিস্টের কাজ করত সাধনা। তার মাথায় বিরাট দায়দায়িত্ব।

এভাবে বছরখানেক চলবার পর জয়ার জন্ম। চন্দ্রার ইচ্ছা ছিল না ছেলেমেয়ে হোক। ডাক্তারের কাছে গিয়ে অ্যাবরসান করিয়ে নিতে চেয়েছিল। কেননা ছেলে মেয়ে মানেই 'ফিগার' নষ্ট হয়ে যাওয়া ; অনেক স্বাধীনতা কাট-ছাঁট হওয়া। তখন হুটহাট যেখানে সেখানে বেরুনো যায় না। একটা অদৃশ্য খাঁচার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে আনতে হয়।

শিবনাথ কিন্তু অ্যাবরসানে রাজী হন নি। গাদা গাদা কাচ্চাবাচ্চায় বাড়ি বোঝাই হয়ে যাক, কখনই সেটা তাঁর কাম্য ছিল না! তাই বলে একটা কি দুটি ছেলেমেয়ে হবে না, এটাও শিবনাথ ভাবতে পারেন নি। তাঁরই জন্য জয়া অপরিণত ভ্রূণে ডাক্তারের ছুরিতে নষ্ট না হয়ে গিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছিল। বাবার কাছে এই কারণে সে গভীর কৃতজ্ঞ।

স্বামীর জেদের ফলে জয়াকে জন্ম দিলেও নিজের স্বাধীনতা খোয়াতে চায় নি চন্দ্রা। সে ছিল বম্বের হাই সোসাইটির অত্যন্ত 'মড' মেয়ে। তার ক্লাব ছিল, শিবনাথের সঙ্গে ফাংশান ছিল, 'ফিগার' স্কুলে যাওয়া ছিল, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-হুল্লোড় ছিল,। শিবনাথের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তারও নতুন নতুন অনেক 'ফ্যান' বেড়ে গিয়েছিল। জননী হবার দাম হিসেবে এ সব ছাড়তে

সে কোন কারণেই রাজী ছিল না। নার্সিং হোমে থেকে ফিরে একটু সুস্থ হয়েই সে তার জীবনের পুরনো রুটিনে ফিরে গিয়েছিল।

জয়ার জন্য আয়া ছিল ঠিকই। পয়সা দিয়ে যত্ন যতটা কেনা যায় তার সব ব্যবস্থাই ছিল। শুধু ছিল না মাতৃস্নেহ। তবে অযাচিতভাবে জন্মের পর থেকে একজনের মমতা সে পেয়েছে। সেই মানুষটি হল সাধনা।

ততদিনে সাধনার সঙ্গে এ. বাড়ির সম্পর্ক আরো গভীর হয়েছে। রোজ একবার করে শিবনাথদের ফ্ল্যাটে তার আসা চাই। স্বামীর দুর্দান্ত ফ্যান এই ছিপছিপে গরিব স্ট্রাগলিং মেয়েটা সম্পর্কে চন্দ্রার দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কা কিছুই ছিল না। নানাভাবে চারদিকে নিজেকে সে এত ছড়িয়ে দিয়েছিল যে সাধনাকে নিয়ে ভাবার জন্য দিনে পাঁচ মিনিটও তার সময় ছিল না। সাধনা সম্পর্কে যদি তার কোন মনোভাব থেকে থাকে সেটা হল অবজ্ঞা। দেখা হলে 'কি, কেমন আছে' বা 'বোসো'—এই রকম দু-একটা কথা বলত চন্দ্রা। বেশির ভাগ দিন আবার তাও বলত না। কিন্তু জয়া হবার পর এই সাধনা সম্বন্ধেই তার আগ্রহ দারুণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় রোজই সে সাধনাকে বলতো আজ তার ফ্লোর শো আছে কিংবা পার্টি অথবা মাধ আইল্যাণ্ডে পিকনিক। সাধনা তো কাছেই থাকে। সে যেন এসে জয়াকে মাঝে মাঝে দেখে যায়। অফিস আর বাড়ির কিছু কাজকর্ম ছাড়া দিনের অনেকখানি সময় সাধনার কেটে যেত জয়ার কাছে কাছে। অবশ্য শিবনাথও তাঁর নানারকম ব্যস্ততার মধ্যে সময় পেলেই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন।

এ সব জয়ার জানার কথা নয়! সে শুনেছে শিবনাথের কাছে। শিবনাথ জয়ার কাছে তাঁর জীবনের কোন কথাই গোপন করেন নি।

ছ-সাত বছর বয়স থেকে সব কথা অবশ্য মনে আছে জয়ার। চন্দ্রা আগের মতোই ক্লাব-পার্টি, হৈ-হুল্লোড় আর সেনসেসনের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল। ততদিনে জয়া স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ির কাছে স্কুল বাস এসে যেত। কাজেই সাড়ে ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে স্নানটান সেরে ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে থাকতে হত।

বম্বে শহরে সূর্যোদয় হয় সাতটায়। সাড়ে ছ'টায় এখানে অন্ধকার থাকে।

জয়ার মনে পড়ে না, চন্দ্রা ক'দিন তাকে ঘুম থেকে তুলে স্কুলের জন্য রেডি করে দিয়েছে। আগের দিন 'লেট নাইট' করার জের হিসেবে তখন সে ঘুমোচ্ছে। ন'টার আগে তার ঘুম ভাঙতো না। শিবনাথ কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় নিজে উঠে জয়ার ঘুম ভাঙিয়ে চাকর-বাকরদের তুলে স্নানের জল গরম করিয়ে দিতেন। স্নান সারতে সারতে রোদ উঠে যেত। রোদ উঠলেই উল্টো দিকের 'চাওল' থেকে সাধনা মাসী চলে আসত। ততদিনে তাকে 'মাসী' বলতে শুরু করেছে জয়া। সাধনা এসেই ক্ষিপ্র হাতে তাকে স্কুল ড্রেস পরিয়ে, চুল আঁচড়ে, রিবন বেঁধে, ব্রেকফাস্ট খাইয়ে পুরোপুরি রেডি করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে যেত। তাকে আবার তৈরি হয়ে ট্রেন ধরে অফিসে ছুটতে হবে।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে ভীষণ খারাপ লাগত জয়ার। তখন মা বা বাবা, কেউ বাড়িতে নেই। বাবা গান রেকর্ডিং-এ কি মিউজিক ডিরেক্টরদের বাড়ি কিংবা অন্য কোন কাজে বেরিয়ে গেছেন। মা হয়ত বাবার সঙ্গেই গেছে। তবে বেশির ভাগ দিন অন্য বন্ধুদের সঙ্গেও বেরিয়ে যেত। বাড়িতে চাকর-বাকররা থাকলেও নিজেকে ভয়ানক একলা মনে হত জয়ার। তবে খুব বেশীক্ষণ না। সন্ধ্যেবেলা গ্যালপিং ট্রেনে বাড়ি গিয়েই তার কাছে ছুটে আসত সাধনা মাসী। তার পড়া দেখিয়ে দেবার জন্য টিউটর ছিল। সন্ধ্যে-বেলা তিনি পড়তে আসতেন। ঘণ্টাখানেকের বেশী থাকতেন না। পড়াশোনা হয়ে গেলে খানিকক্ষণ গল্পটল্প করে তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে যেত সাধনা।

মায়ের সঙ্গে জয়ার সম্পর্কটা ছিল অদ্ভুত। তার সঙ্গে দেখা হত খুব কমই। সকালবেলা যখন সে স্কুলে যাচ্ছে, মা তখন ঘুমতো। আবার জয়া যখন ঘুমোচ্ছে, মা তখন বাড়ি ফিরতো। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে গেলে দারুণ মিষ্টি হেসে বলত, 'হাউ আর ইউ সুইটি?' কিংবা 'কেমন পড়াশোনা হচ্ছে তোমার?' ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন দিন তার জন্য প্রকাণ্ড একটা জাপানী ডল, কিংবা মস্ত একটা চকোলেট বা প্যাস্ট্রি নিয়ে আসত চন্দ্রা। ইচ্ছা হলে এক-আধদিন তাকে গাড়িতে করে মেরিন ড্রাইভ, জুহু বীচ বা গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে বেড়াতে নিয়ে যেত। নিজের মায়ের মতো নয়; চন্দ্রার ব্যবহারটা ছিল অনেকটা কোন বন্ধুর মায়ের মতো।

এইভাবেই চলে যাচ্ছিল। আচমকা একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। শিবনাথের গলার ভেতরে কিছুদিন থেকেই মাংসের একটা গ্রোথ হচ্ছিল। প্রথম প্রথম সেটা ছিল সুর্যের মতো ছোট ; কয়েক মাসের মধ্যে সেটা বড় হয়ে হয়ে মার্বেল গুলির মতো হয়ে উঠল। ভীষণ যন্ত্রণা হত ; খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। স্পেশালিস্টেদের দেখাতে তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। জানালেন, ম্যালিগনাণ্ট গ্রোথ হল খুবই বিপদের কথা। বায়োপ্সি করিয়ে অবশ্য খারাপ রিপোর্ট পাওয়া গেল না। তবে স্পেশালিস্টরা জানালেন, অপারেশন করাতেই হবে। মাংসের গুলিটা কেটে বাদ দিতে পারলে শিবনাথ আবার আগের মতো গাইতে পারবেন।

নার্সিং হোমে অপারেশন করা হল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর দেখা গেল, ভোকাল কর্ডে এমন একটা গোলমাল হয়ে গেছে যে শিবনাথ আর গাইতে পারছেন না। কথা তিনি অবশ্য বলতে পারলেন। তবে কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হয়ে গেল। কেমন যেন কর্কশ আর চাপা। স্পেশালিস্টদের কাছে ছোটাছুটি করেও কিছু হল না। এই সময়টা শিবনাথকে ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত মানুষের মতো দেখাতো। দিনরাত তিনি কাঁদতেন।

প্রথম দিকে শিবনাথের জন্য চন্দ্রার খুবই সহানুভূতি ছিল। ক্লাব এবং বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সব সময় স্বামীর কাছেকাছেই থাকত সে। কিন্তু যেই জানা গেল শিবনাথ আর গাইতে পারবেন না, তার ব্যবহার এবং চালচলন দ্রুত বদলে যেতে লাগল। ক্লাব, হৈ-হুল্লোড় বাড়িয়ে দিল সে। রাতে ফেরার ঠিক থাকত না। দু-এক রাত হয়ত আসতই না।

এই সময়টা স্কুলে যেত না জয়া। সর্বক্ষণ বাবার কাছে কাছে থাকত। আরেকটি মানুষও গভীর সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। বাবার অপারেশানের সময় অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছিল সাধনা। তারপর ছুটি বাড়িয়ে প্রায় সারাদিনই এ বাড়িতে থাকত। করুণ বিষণ্ণ চোখে বাবাকে লক্ষ্য করত আর বলত, 'অত ভেঙে পড়বেন না।'

শিবনাথ বলতেন, 'আই অ্যাম ফিনিশড্। আমি শেষ হয়ে গেছি সাধনা।' তাঁর চোখ বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াতে থাকত। শুধু কাঁদতেনই না তিনি, কারো সঙ্গে কথা-টথাও বলতেন না, খেতেন না, এমন কি

বাড়ি থেকে বেরুতেন না পর্যন্ত। গভীর ঘন বিষাদ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল যেন।

দিনের বেলাটা নিজের অফিসের জন্য তাড়াহুড়োয় পেরে উঠত না সাধনা মাসী। কিন্তু রাত্তিরে জোরজার করে কাছে বসে শিবনাথকে সে খাইয়ে যেত।

আবছাভাবে আরো একটা কথা মনে পড়ে জয়ার। মায়ের সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো সাধনা মাসীর দেখা হয়ে গেলে সে বলত, 'চন্দ্রাদি, আপনি কেন এমন করছেন? এই সময়টা শিবনাথদার কাছে আপনার থাকা দরকার। হী নীডস্ ইওর কোম্পানি।'

চন্দ্রা সাধনার নাকে আলতো করে টুসকি মেরে বলত, 'শিবনাথের জন্যে তোর খুব সিমপ্যাথি দেখছি।' শেষের দিকে সাধনা মাসীকে 'তুই' করেই বলত সে।

সাধনা বলত, 'মানুষের দুঃখের দিনে সিমপ্যাথি হওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'তা হলে এক কাজ কর।'

'কী?'

'আমার হয়ে শিবনাথের ভাবনাটা তুই-ই ভাব।'

এ কথার কী আর উত্তর হয়; সাধনা চুপ করে থাকতো।

মনে পড়ে, এই সময়টা বাবার গানের রেকর্ডিং একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফাংশান থেকে আর ডাক আসতো না। পপ ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজের মিউজিক পেজে আর তাঁর ছবি ছাপা হত না। আগে রেকর্ড কোম্পানির লোক, ফিল্মের লোক, ফাংশানের অর্গানাইজাররা, ফ্যানেরা সারাক্ষণ শিবনাথের গায়ে মাছির মতো আটকে থাকত। তা ছাড়া রোজ কোন না কোন পপ ম্যাগাজিন থেকে তাঁর ইণ্টারভিউ নিতে লোক আসত। তিন মিনিট পর পর টেলিফোন বেজে উঠত। অপারেশনের পর যেই জানাজানি হয়ে গেল তিনি আর গাইতে পারবেন না, লোকজন আসা বন্ধ হয়ে গেল। টেলিফোনটা একেবারে বোবা হয়ে রইল। কোন ম্যাজিসিয়ান যেন কয়েক পলকের মধ্যে রবার দিয়ে পেন্সিলের দাগ তুলে দেবার মতো তাঁর চারপাশ থেকে হৈ-চৈ, ভিড়, গ্ল্যামার—সব কিছু উধাও করে দিল। একজন শুধু তাঁকে ছেড়ে গেল না; সে সাধনা মাসী।

সেই ছেলেবেলাতেও জয়া টের পেয়েছিল, আগের মতো বাবার হাতে টাকা আসছে না। পুরনো রেকর্ড বিক্রি থেকে কিছু রয়ালটি আসত। আর আসত ব্যাঙ্কে জমানো টাকার কিছু ইন্টারেস্ট। আস্তে আস্তে বাড়ির চাকর-বাকর কমে একজনে এসে ঠেকল। একটা ঝকঝকে নতুন মডেলের আমেরিকান গাড়ি কেনা হয়েছিল; সেটা বিক্রি হয়ে গেল। মানুষের স্মৃতি থেকে, গ্ল্যামারের ঝালর বসানো ঝকঝকে মঞ্চ থেকে এক ধাক্কায় শিবনাথকে কেউ যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে ছুঁড়ে দিল। তিনি মুছে যেতে লাগলেন।

এই সময়কার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে জয়ার। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে অবাক হয়ে গেল। শিবনাথের ঘরের দরজা আটকানো। বাবার গান বন্ধ হবার পর স্কুল থেকে ফিরে রোজই জয়া একই ছবি দেখত; বাবা ড্রইং রুমের জানলার পাশে চুপচাপ বসে আছেন। সেই দিনটাই শুধু ছিল অন্য রকম।

বাড়ির একমাত্র গোয়াঞ্চি চাকর গোমেজ জানিয়েছিল, শোবার ঘরে সাহেব আর মেমসাহেব রয়েছেন। অর্থাৎ বাবা আর মা। এ সময়টা মা কোনদিন বাড়িতে থাকত না। তা ছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে জয়া বুঝতে পারছিল মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা ঠিক আগের মতো নেই। অনেক দিন দু-জনকে কথা বলতে দেখেনি সে। হঠাৎ সেই বিকেলবেলায় দরজা বন্ধ করে ওঁরা কী করতে পারেন?

সেই বয়সেই অনেক কিছু শিখে গিয়েছিল জয়া। সে বুঝেছিল, মা-বাবার বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দেওয়া ঠিক হবে না। সোজা নিজের পড়ার ঘরে চলে গিয়েছিল জয়া। সেখানেই ছোট একটা ওয়ার্ডরোবে তার জামা-টামা থাকত। স্কুলের ব্যাগ রেখে ড্রেস বদলে বাথরুম থেকে মুখটুখ ধুয়ে এসেছিল। গোমেজ খাবার এনে দিলে চুপচাপ খেয়ে ড্রইং রুমে বাবা যেখানে ছবি হয়ে বসে থাকতেন সেখানে গিয়ে বসেছিল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে শোবার ঘরের দরজা খুলে মা-বাবা বেরিয়ে এসেছিলেন। জয়া লক্ষ্য করেছিল, বাবার মুখটা একেবারে রক্তশূন্য। একটা ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে অনেকদিন ভুগবার পর

যেমন হয় তেমনি দুর্বল এলোমেলো পায়ে প্রায় টলতে টলতেই তিনি ড্রইং রুমের একটা সোফায় এসে বসেছিলেন।

মাকেও খুব একটা সুস্থ স্বাভাবিক মনে হয় নি জয়ার। গলগল করে ঘামছিল সে, তার পা-ও ঠিকমতো পড়ছিল না। মনে হচ্ছিল, অদৃশ্য বক্সিং-রিং-এ অনেকক্ষণ রক্তাক্ত যুদ্ধের পর দুই ক্ষতবিক্ষত প্রতিদ্বন্দ্বী যেন বেরিয়ে এসেছে।

মা ড্রইং রুমের ভেতরে আসে নি। বাইরের চওড়া প্যাসেজ থেকে বলেছিল, 'তুমি কখন স্কুল থেকে ফিরলে সুইটি?'

জয়া একবার বাবাকে একবার মাকে দেখতে দেখতে আবছা গলায় বলেছিল, 'অনেকক্ষণ।'

'পড়া পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'গুড।' বলে একটু থেমে মা আবার বলেছিল, 'আমি এখন বেরুচ্ছি। আজ আর ফিরব না। কাল তোমার স্কুল আছে?'

জয়া মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল—আছে।

'কাল তুমি স্কুলে যেও না। আমি সকালবেলা এসে তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। বলে আর দাঁড়ায় নি মা; বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রা হঠাৎ হঠাৎ এক-আধদিন তাকে সিনেমা কি চিলড্রেন্স শো অথবা স্কেটিং রিংকে নিয়ে যেত। সারাদিন খুব হৈচৈ করে, বাইরে কোথাও খেয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসত। কিন্তু জয়ার মনে হয়েছিল, পরের দিন স্কুল কামাই করিয়ে মা যে তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে, সেটা শুধু বেড়াবার জন্যই না; তার মধ্যে অন্য কিছু আছে।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলেন, 'জয়া—'

শিবনাথের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠেছে জয়া; সে বাবার দিকে তাকিয়েছিল। শিবনাথ বলেছিলেন, 'চল, আমরা একটু ঘুরে আসি।'

গলায় মাংসের গুলির মতো সেই গ্রোথটা হবার পর থেকে বাবা কখনও

তাকে নিয়ে কোথাও বেরোন নি। জয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে এক ধরনের ভয় তার বুকের থেকে লম্বা পা ফেলে যেন উঠে আসতে শুরু করেছিল। মা আর বাবার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।

একটু পর শিবনাথ তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাস্তায় একটা ট্যাক্সিতে উঠে শিবনাথ বলেছিলেন, 'তোর সঙ্গে একটা খুব দরকারী কথা আছে জয়া– '

জয়া জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা বাবা—।

'গাড়িতে না ; কোথাও এক জায়গায় বসে বলব ।।

প্রথমে তাঁরা এসেছিলেন জুহু বীচে। জলের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কিছু বলতে পারেন নি শিবনাথ। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চারদিকে লোক গিসগিস করছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরপাখিরা অদ্ভুত টুই টুই শব্দ করে মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল।

জয়া দম বন্ধ করে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে ছিল। এক সময় কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী বলবে বাবা ?'

আচমকা উঠে পড়েছিলেন শিবনাথ, 'না, এখানে না। চল আর কোথাও যাই—'

জয়াকে নিয়ে আরেকটা ট্যাক্সি ধরে শিবনাথ এবার এসেছিলেন ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে, সেখান থেকে হাজী আলিতে, তারপর নরীম্যান পয়েন্ট ছুঁয়ে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ায়। কিন্তু কোথাও নিজের কথাটা বলতে পারেন নি। সব জায়গাতেই কয়েক মিনিট বসে থেকে হঠাৎ তিনি উঠে পড়েছেন। তারপর বেশ রাত করেই ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছেন। যত সময় কাটছিল ততই তাঁকে বড় বেশী অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল। বাবার এরকম অসুস্থতা আগে কখনও দেখে নি জয়া। তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

ফ্ল্যাটে ফেরার পর জয়া দেখেছিল, সাধনা মাসী বসে আছে। অফিস ছুটির পর তাদের 'চাওলে' ফিরে পোশাক বদলে কিছু খেয়েই চলে আসত সাধনা। তার কথা সেদিন কারো মনে ছিল না।

এত রাতে জয়া আর শিবনাথকে ফিরতে দেখে সাধনা খুবই অবাক হয়ে

গিয়েছিল। এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি! সে বলেছিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা ?'

শিবনাথ বলেছিলেন, 'জয়াকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এলাম। তুমি কখন এসেছ ?'

'অফিস ছুটির পর যেমন আসি।'

'সেই থেকে বসে আছ ?'

সাধনা উত্তর দেয় নি।

শিবনাথ একটু ভেবে বলেছিলেন, 'যাক, ভালই হল। তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

জয়া চমকে উঠেছিল। শিবনাথের কথাটা যে কী, সে জানে না। তবে বাবা তাকে যা বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি সেই কথাই কি সাধনা মাসীকে বলবেন ? সাধনাও তার মতোই জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা ?'

'পরে বলব। অনেক রাত হয়ে গেছে। জয়াকে আগে খাইয়ে দাও। ও শুয়ে পড়ুক।' শিবনাথ যে কোন কাজের কথা, বিশেষ করে তাঁর এবং জয়ার ব্যাপারে, অসংকোচে সাধনা মাসীকে বলতে পারতেন। কেননা ততোদিনে সাধনার ওপর অনেক বিষয়েই নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন তিনি।

জয়া বুঝতে পারছিল, বাবা তার সামনে সাধনা মাসীকে কিছু বলবে না। কিন্তু কথাটা জানার জন্য ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

মা-বাবার শোবার ঘরের একপাশে জয়ার জন্য ছোট একটা 'কট' ছিল। জয়াকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে তার 'কটে' শুইয়ে গায়ে চাদর টেনে বেশী পাওয়ারের লাইট নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের একটা নীল লাইট জ্বালিয়ে ড্রইং রুমে চলে গিয়েছিল সাধনা। সেখানে শিবনাথ তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এদিকে জয়া ঘুমোতে পারছিল না। সাধনা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে পড়েছিল। খুব আস্তে পা টিপে টিপে দরজার কাছে চলে এসেছিল। মাঝখানে একটা প্যাসেজ। ড্রইং রুমটা তার কোণাকুণি একটা জায়গায়। শোবার ঘরের দরজার কাছ থেকে সেটার ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। বাবা আর সাধনা মাসী তখন মুখোমুখি বসে।

বাবা ভাঙা ভাঙা চাপা গলায় কী যেন বলছিলেন সাধনা মাসীকে। জয়া শুনতে পায় নি। তবে সাধনা মাসী প্রায় শিউরে উঠেছিল, 'না-না, এ আপনি কী বলছেন ?'

বাবার গলা এবার কিছুটা স্পষ্ট শুনিয়েছিল, 'এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই সাধনা।'

'আপনি চন্দ্রাদিকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।'

'বলেছি। কিন্তু আমারও তো আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে। আই অ্যাম ব্রোক, আই অ্যাম ফিনিশড।' বলে বাবা দু-হাতে মুখ ঢেকে বালকের মতো কেঁদে উঠেছিলেন।

সাধনা মাসী ওধার থেকে উঠে এসেছিল। বাবার কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর গলায় বলেছিল, 'কাঁদবেন না।' দূর থেকে জয়া দেখতে পেয়েছিল সাধনা মাসীর চোখও ধীরে ধীরে জলে ভরে যাচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ পর এক রকম জোরজার করেই বাবাকে খাইয়ে চলে গিয়েছিল সাধনা। অনেক রাতে বাবা শুতে এসেছিলেন। তার আগেই অবশ্য জয়া তার কটে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, মায়ের সম্বন্ধেই সাধনা মাসীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বাবা। কী বলছিলেন তিনি ? কাঁদছিলেনই বা কেন ? জয়ার বুকের ভেতর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

মা নেই। বাবা বিরাট ডবল-বেড খাটে আবছা নীলাভ অন্ধকারে অনেক-ক্ষণ সিলুয়েট একটা ছবির মতো বসে ছিলেন। তারপর হঠাৎ জয়ার কটের দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় ডেকেছিলেন, 'জয়া —'

বাবা কি টের পেয়ে গেছেন, জয়া এখনও ঘুমোয় নি! সাড়া দেবে কিনা, প্রথমটা সে ঠিক করতে পারে না। তারপর আস্তে করে বলেছিল, 'কী বলছ ?'

'এখনও ঘুমোস নি ?'

'ঘুম পাচ্ছে না।'

বাবা চুপ করে থেকেছেন কয়েক পলক। তারপর বলেছেন, জেগে আছিস, ভালই হয়েছে। আমার খাটে আয়।'

জয়া বাবার কাছে চলে গিয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, 'তোর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।'

জয়া বলেছিল, 'বিকেলবেলাও তো তাই বললে। তারপর কত জায়গায় নিয়ে গেলে কিন্তু তোমার দরকারী কথাটা বললে না।'

'তখন বলতে পারি নি। চারদিকে লোকজন ছিল। আলো ছিল, তুই আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলি। নিজের মুখ দেখিয়ে সেই কথাটা আমি কিছুতেই বলতে পারব না।' বাবা উঠে গিয়ে জিরো পাওয়ারের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ঘর গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা এবার বলেছিলেন, 'তোর মায়ের সঙ্গে আমার কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। এখন তুই তা বুঝবি না; বড় হলে বুঝতে পারবি। যাই হোক, আমরা ঠিক করছি একসঙ্গে থাকব না। তোর মা এখন তোর মামাবাড়ি চলে যাবে।'

শ্বাস আটকে আসছিল জয়ার। দুর্বল ভাঙা গলায় সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা কি আর কোনদিন এখানে আসবে না?'

'বোধ হয় না।'

'তুমি এই কথাগুলো সাধনা মাসীকে তখন বলছিলে?'

'তুই শুনেছিস?' গলার স্বর শুনেই বোঝা গিয়েছিল বাবা চমকে উঠেছেন।

আস্তে করে নিশ্বাস ফেলে জয়া বলেছিল, সবটা শুনি নি।'

একটু চুপ। তারপর বাবা বলেছিলেন, 'তুই ইচ্ছে করলে আমার কাছে থাকতে পারিস। ইচ্ছে করলে তোর মায়ের কাছেও থাকতে পারিস। কার কাছে থাকবি?'

বাবাকে সেই মুহূর্তে ভয়ানক দুঃখী এবং অসহায় মনে হয়েছিল জয়ার। হঠাৎ চোখের গভীর থেকে স্রোতের মতো কিছু ঝলক দিয়ে উঠে এসেছিল। দু-হাতে শিবনাথকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে জড়ানো গলায় বলেছিল, 'আমি তোমার কাছেই থাকব বাবা।'

গভীর আবেগে দু-হাতে জয়াকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়েছিলেন শিবনাথ। জয়া টের পেয়েছিল তার মাথায়-কপালে-ঘাড়ে-বুকে সারারাত

বাবার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে গেছে। মনে আছে, সেদিন থেকে গোটা ছেলেবেলাটা বাবার বুকের গভীরে ঘুমিয়ে কেটে গেছে তার।

পরের দিন একা আরামদায়ক বিরাট জাপানী গাড়ি করে সকালবেলাতেই মা এসেছিল। এসে আর অপেক্ষা করে নি বা বাবার সঙ্গে কোন কথা-টথা বলে নি। চটপট জয়াকে ভালো দামী পোশাক পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সারা সকাল গোটা বম্বে শহর ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেক রকম পোশাক, পুতুল, খেলার জিনিস কিনে দিয়েছিল। তারপর দুপুরবেলা ওরা এসেছিল গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে একটা বিশাল এয়ার-কণ্ডিশানড হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ খেতে খেতে চন্দ্রা বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে জয়া।'

জয়া টেবল থেকে মুখ তুলে বলেছিল, 'জানি'।'

চোখ ঈষৎ কুঁচকে চন্দ্রা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী জানো?'

ভয়ে ভয়ে জয়া বলেছিল, 'বাবা আর তুমি এক জায়গায় থাকবে না।'

চন্দ্রা স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই তোমার বাবা বলেছে।'

'হ্যাঁ।'

'ভালই হয়েছে। আমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। বড়দের ব্যাপার; এখন তোমার বোঝার দরকারও নেই। তোমার বাবা যা বলেছে তাই ঠিক। এখন থেকে আমরা দু জায়গায় থাকব। প্রবলেমটা তোমাকে নিয়ে। তুমি কার কাছে থাকবে?'

জয়ার খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মায়ের দিকে সে তাকায় নি; মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে ছিল।

চন্দ্রা বলেছিল, 'কী হল, কথা বলছ না কেন?'

জয়া এবার আস্তে করে বলেছিল, 'আমি বাবার কাছে থাকব।'

এই উত্তরটা আশা করে নি চন্দ্রা। বলেছিল, 'ভালো করে ভেবে বল।'

'আমি বাবার কাছে থাকব।'

'অবস্টিনেট গার্ল। সব বাচ্চাই তাদের মায়ের কাছে থাকতে চায়। তোমার নেচার একেবারে আলাদা।'

'আমি বাবার কাছে থাকব।'

'ঠিক আছে।' মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল চন্দ্রার। সে বলেছিল, 'তোমার কপালে দুঃখ আছে। অ্যাণ্ড ইউ আর ইনভাইটিং ইট।'

লাঞ্চের পর জয়াকে সায়নে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল মা। এর কিছু-দিন বাদে বাবার সঙ্গে আইনসম্মত সেপারেশন হয়ে গিয়েছিল মায়ের। এবং তারও কয়েক মাস পর খবর পাওয়া গিয়েছিল মা আবার বিয়ে করেছে।

ডাইভোর্স হবার আগে এবং দ্বিতীয় বিয়ের পর মাঝে মাঝে জয়াকে দেখতে সায়নের ফ্ল্যাটে চলে আসত চন্দ্রা। শিবনাথের কাছে বলে কিছুক্ষণের জন্য তাকে কোন কোনদিন বেড়াতে নিয়ে যেত। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে জয়ার আলাপও করিয়ে দিয়েছিল মা।

চন্দ্রার দুনম্বর স্বামী কার্নাল সিং মানুষ হিসেবে চমৎকার। বিরাট পোলো খেলোয়াড়; সারা দেশ জুড়ে তখন তাঁর নাম। কাগজে প্রায়ই ছবি বেরোয়। তা ছাড়া ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসে অঢেল টাকা।

স্ত্রীর প্রথম স্বামীর মেয়ের জন্য কার্নাল সিং এক ধরনের স্নেহ অনুভব করতেন। চন্দ্রা জয়াকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেই প্রচুর দামী দামী জামা, নাম-করা কনফেসানারদের দোকান থেকে প্যাস্ট্রি কি কেক, ডলস হাউস থেকে বিদেশী খেলনা কিনে দিতেন। জয়ার মনে আছে, পাছে বাবা দুঃখ পান সে জন্য চন্দ্রার সঙ্গে কোনদিন তিনি সায়নের ফ্ল্যাটে আসেন নি। সত্যিকারের ভদ্রলোক কার্নাল সিং এবং পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত রিয়েল স্পোর্টম্যান। তবু তাঁর কাছে গিয়ে খুবই আড়ষ্ট হয়ে যেত জয়া; ভেতরে ভেতরে এক ধরনের আক্রোশ অনুভব করত।

বাবার কোন অন্যায় ছিল না। তিনি কখনও মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি। তবু কেন বাবাকে ছেড়ে আবার বিয়ে করেছিল সে? সেদিন তা বুঝতে পারে নি জয়া; পরে বড় হয়ে বুঝেছে।

মা বাবাকে ঠিক ভালোবাসে নি! যা তাকে আকর্ষণ করেছিল তা হল বাবার নাম, গ্ল্যামার। কিন্তু যেই বাবাকে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড থেকে সরে আসতে হল, মায়ের আর ইলিউসান রইল না। মা তাঁকে ছেড়ে ঝুঁকল গ্ল্যামারওলা স্পোর্টসম্যান কার্নাল সিংয়ের দিকে।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটছিল। গান বন্ধ হবার পর গাঢ় গভীর বিষাদ বাবার স্থায়ী সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। মায়ের দ্বিতীয় বার বিয়ের পর আর তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। রোজগারের দিকটাও দ্রুত খারাপ হয়ে আসছিল। মানুষের স্মৃতি খুবই ঠুনকো জিনিস। বাবাকে চটপট সবাই ভুলে যাচ্ছিল। তিনি বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর রেকর্ড আর ক'খানা বিক্রি হত! রয়ালটি দিনের পর দিন কমে আসতে লাগল। ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্টই তখন ভরসা।

মা চলে গেলেও সাধনা কিন্তু তাদের ছেড়ে যায় নি। বড় ডানা মেলে সে যেন জয়া আর শিবনাথকে আগলে রাখতে চাইছিল। রোজই এসে সে বাবাকে বলত, 'এ রকম করলে আপনি কিন্তু বেশীদিন বাঁচবেন না। সারাদিন ঘাড়মুখ গুঁজে মন খারাপ করে বাড়িতে বসে থাকার কিছু একটা করুন।'

শিবনাথ ক্লান্ত গলায় বলতেন, 'কী করব?'

যা হোক কিছু। আপনার লাইফ এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

'আমি যে গান ছাড়া আর কিছুই শিখি নি।'

'আর কিছুই না?'

সেই মুহূর্তে শিবনাথের হয়তো বিজলীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বিজলী ভালো সরোদ, ভায়োলিন আর সেতার বাজাতে পারত। তার কাছে গানই শুধু শেখেন নি শিবনাথ, বাজনারও তালিম নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'একটু আধটু বাজনা জানি।'

খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিল সাধনা, 'আপনি বাজনা জানেন, অথচ চুপচাপ বসে আছেন! এমন করে নিজেকে শেষ করে ফেলার কোন মানে হয়! মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যাঁরা বাজান তাঁদের দাম অর্টিস্টদের চাইতে কম না কি? যে বাজনা আপনার পছন্দ আজই কিনে আনবেন।'

বাঁচবার একটা রাস্তা পেয়ে গিয়েছিলেন শিবনাথ। আর সাধনাই তাঁর দুঃখের দিনে সেটা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

দিন কয়েক বাদেই একটা ভায়োলিন কিনে এনেছিলেন শিবনাথ। দিন

রাত তাই নিয়ে রেওয়াজ করতে শুরু করেছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে হাত তৈরিও হয়ে গিয়েছিল।

মাঝখানে ফিল্মের লোকেদের সঙ্গে, অর্কেস্ট্রা কমপোজারদের সঙ্গে, মিউজিক ডিরেক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। সাধনাই শিবনাথকে তাড়া দিয়ে দিয়ে তাদের ফোন করালো। তারপর একদিন মিউজিক হ্যাণ্ড হয়ে আবার তিনি গানের ওয়ার্ল্ডে ফিরে এলেন। বিষাদময়তার লম্বা ফাঁদ থেকে এইভাবে তিনি অনেকখানি বেরিয়ে আসতে পারলেন।

কয়েকটা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কবে যে সাধনা মাসী বাবাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে, জয়ার মনে পড়ে না। তখন সে ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ে। আগেকার অভ্যাসমতো বাবার কাছেই শুতো সে। হঠাৎ একদিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর জয়া ঘুমোতে যাচ্ছে, সাধনা বলেছিল, 'আজ থেকে তুমি আর বাবার কাছে শোবে না। তোমার জন্য আলাদা খাটে বিছানা করে দিয়েছি।'

জয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কেন?'

'তুমি বড় হয়ে গেছ।'

অন্য ঘরে নয়, বাবার ঘরেরই আরেক দিকে জয়ার জন্য খাট পেতে দেওয়া হয়েছিল। সাধনা গোমেজকে দিয়ে কখন যে তার আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছে, জয়া আগে জানতে পারে নি। সাধনা মাসীর চোখ সব দিকে।

যাই হোক, সাধনা যেমন তাদের আগলে আগলে রাখছিল তেমনি নিজেদের সংসারটাকে টেনে যাচ্ছিল। ভাইবোনদের স্কুলেকলেজে পাঠিয়ে পড়াশোনা শেখাচ্ছিল। ওর মধ্যেই প্রভিডেণ্টফাণ্ড থেকে লোন নিয়ে একটি বোনের বিয়ে দিয়েছিল! এক বোনের ব্যবস্থা হলেও তখনও তার প্রচুর দায়-দায়িত্ব। দায়িত্বপালনের জন্য অনেক টাকা দরকার। তাই নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে ওখানে ভালো চাকরির জন্য দরখাস্ত করে যাচ্ছিল সে।

জয়ার মনে পড়ে যে বছর সে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পেল সেই বছরই সাধনা পুণার কাছে চান্দেলিতে একটা বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে পাবলিক রিলেশনস অফিসারের ভালো চাকরি পেয়ে গেল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা

পাবার পরই শিবনাথের কাছে দৌড়ে এসেছিল সাধনা মাসী। বলেছিল, 'আমি কী করব?'

বাবা তার হাত থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, 'বেশ ভালো চাকরি। তুমি ওটা নিয়ে নাও—'

কিন্তু—'

'কী?'

'চাকরিটা নিলে আমাকে চান্দেলিতে গিয়ে থাকতে হবে।'

জয়া কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে লক্ষ্য করেছিল, বাবার মুখে একটা ছায়া পড়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর অল্প হেসে তিনি বলেছিলেন, 'তা তো হবেই। সারা জীবন অনেক স্ট্রাগল করেছ! চাকরিটা নিলে সব দিক থেকেই ভালো হবে। এটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু আমি চলে গেলে—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল সাধনা।

বাবা গভীর গলায় এবার বলেছিলেন, 'তুমি আমাদের কথা ভাবছ তো?'

আস্তে করে ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছিল সাধনা।

বাবা বলেছিলেন, 'আমাদের জন্যে তুমি অনেক করেছ। তোমার ঋণ কখনও শোধ করা যাবে না। আমাদের কথা ভেবে যদি চাকরিটা না নাও, আমাদের অপরাধের শেষ থাকবে না।'

মাসখানেক পর সাধনা তাদের গোটা ফ্যামিলি নিয়ে চান্দেলিতে চলে গিয়েছিল। পুণা ওখান থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে অনবরত সেখানে বাস যাতায়াত করছে। বম্বে থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ভাইবোনদের পুণার কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল সে।

চলে যাবার আগে জয়াকে আড়ালে ডেকে সাধনা বলেছিল, 'আমি চলে যাচ্ছি। তুমি বড় হয়েছ; বাবাকে সব সময় দেখাশোনা কোরো। বাবার মতো দুঃখী মানুষ খুব বেশী নেই।'

সেই থেকে শিবনাথের খাওয়া-দাওয়া ঘুম-বিশ্রাম কিংবা কাজকর্ম, সবদিকে জয়া সর্বক্ষণ নজর রেখে আসছে।

দেখতে দেখতে আরো ক'টা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে জয়া বি-এ পাস করে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিয়েছে। বম্বে সিটির চারদিক

ঘিরে তখন বিরাট বিরাট মাল্‌টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠতে শুরু করেছে। ওনার-শিপ ফ্ল্যাট কেনার হুজুগ পড়ে গিয়েছিল সেই সময়টা। জমির যা দাম আর কনস্ট্রাকসনের যা খরচ তাতে মাল্‌টিমিলিওনেয়ার ছাড়া এ শহরে নিজস্ব বাড়ি করা অসম্ভব ব্যাপার। জয়া আর সাধনার সঙ্গে পরামর্শ করে শিবনাথ ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে এবং কিছু ধার-টার করে জুহুর ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন। আর খানিকটা ধার শোধের জন্যই জয়াকে চাকরি নিতে হয়েছিল। তা ছাড়া বাবা গান রেকর্ডিং-এ বেরিয়ে গেলে একা একা ভাল লাগত না। চাকরিটা সময় কাটাবার পক্ষে টনিকের মতো।

সায়ন থেকে জুহুর ফ্ল্যাটে উঠে আসার সময় গোমেজ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাদের দেশে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে মধ্যবয়সী মারাঠী বিধবা তারা জয়াদের বাড়িতে কাজ করছে।

যাই হোক, চাকরি নেবার পর জয়ার কাজ বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তার প্রোগ্রাম এই রকম। ঘুম থেকে উঠেই নিজের হাতে চা করে, রুটি সেঁকে, ছানা বনিয়ে বাবাকে খাওয়াতো। এর মধ্যে শিবনাথের একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তাই তাঁর খাওয়া-দাওয়া খুবই ধরা-বাঁধা। মাখন, ঘি, ডিম ইত্যাদি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর জন্য বরাদ্দ ফ্যাট-ফ্রি ডায়েট। নিজে বাবার খাবার তৈরি করে না দিলে খুঁতখুঁতুনি লাগত জয়ার।

শিবনাথকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে হার্টের জন্য ওষুধ খাইয়ে নিজে কিছু খেয়ে নিত। ততক্ষণে সান্তাক্রুজের বাজার থেকে মাছ-আনাজ কিনে ফিরে এসেছে তারা। গ্যাসের উনুনে ডবল রিফাইনড বাদাম তেলে চটপট বাবার জন্য লাইট মাছের ঝোল, খানিকটা গ্রীন ভেজিটেবল সেদ্ধ, একটু স্যালাড, একটু ডাল, নিরামিষ একটা তরকারি রেঁধে জয়া এক ছুটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকত। বাবারটা বাদ দিলে তার আর নিজের জন্য তারাই রাঁধত।

স্নানটান সেরে শাড়িটাড়ি পরে দ্রুত নাকেমুখে গুঁজে অফিস বেরুবার আগে বাবার ঘরে আসত সে এবং তারাকেও ডেকে আনত। শিবনাথ কখন ক'টার সময় কোন ওষুধ খাবেন সব পর পর হাতের কাছে সাজিয়ে রেখে দিত। দুপুরবেলা কখন ভাত খাবেন, বিকেলে কখন চা এবং ফল, সন্ধ্যেবেলায় সেঁকা

পাঁপড় আর ব্ল্যাক কফি—সব পাখি পড়ানোর মতো বাবা এবং তারাকে বলে যেত। তারাকে বলার কারণ, খাবার জন্য বাবাকে সে তাড়া লাগাবে।

গান রেকর্ডিং থাকলে শিবনাথ সকালবেলা স্টুডিওতে বেরিয়ে যেতেন। সেদিন ভোরবেলা উঠে রান্নাবান্না সেরে টিফিন ক্যারিয়ারে তাঁর খাবার সাজিয়ে দিত জয়া। ওষুধগুলো খাওয়ার সময় লিখে একেকটা মোড়ক বানিয়ে পকেটে পুরে দিত।

যাই হোক, সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে আবার বাবার জন্য খাবার তৈরি করত জয়া। দিনের বেলা তাড়াহুড়োয় হয়ে উঠত না ; তবে রাত্তিরে ডাইনিং টেবলে মুখোমুখি বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে খেত দুজনে। অফিসে কী কী ঘটেছে, কোন অফিসার কী বলেছে, কলীগরা কী করেছে, ক্লায়েন্টদের কার কিরকম ব্যবহার, খুঁটিনাটি সব বলে যেত জয়া। শিবনাথও সারাদিন বাড়িতে কী করেছেন, জুহু বীচে কোন কোন দেশের টুরিস্ট সেদিন বেশী এসেছে, ওয়েস্ট-বাউণ্ড প্লেন সেদিন ক'টা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় খবর দিতেন। যেদিন গানের রেকর্ডিং থাকত সেদিন স্টুডিওতে কী কী হয়েছে, তাঁর পুরোনো দিনের গানের কথা মনে করে কোন মিউজিক ডিরেক্টর তাঁকে সহানুভূতি জানিয়েছেন, বীয়ার খাওয়ার জন্য কে জোরজার করেছিল অথচ তিনি খান নি, ইত্যাদি ইত্যাদি সব বলে যেতেন। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বাবাকে রাত জাগতে দিত না জয়া। তাঁকে তাঁর ঘরে শুইয়ে গায়ের ওপর চাদর টেনে লাইট নিভিয়ে নিজের ঘরে চলে আসত। জুহুর ফ্ল্যাটে আসার পর তাদের আলাদা ঘর হয়েছিল।

বাবার চলাফেরা, হাসি, কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরে ছোটবড় ঢেউ, নিশ্বাস-পতন—সব জয়ার চেনা। তার মধ্যে কোথাও একটু হেরফের হলেই সে বুঝতে পারত হয় বাবার শরীর খারাপ হয়েছে, নইলে মন খারাপ। কোন কোনদিন রাত্তিরে বাবাকে শুইয়ে দিয়ে আসার পর জয়া নিজের ঘরে এসে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। আচমকা বিষণ্ণ করুণ একটা সুর তার স্নায়ুতে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ধড়মড় করে উঠে জয়া দৌড়ে গেছে পাশের ঘরে। চোখে পড়েছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বুকের কাছে ভায়োলিন আটকে আস্তে আস্তে ছড় টেনে যাচ্ছেন তিনি। সুরের ভেতর থেকে দুঃখ যেন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে

এসেছে। জয়া জানত, এখনও, জানে, মাকে ভুলতে পারেন নি শিবনাথ। মধ্যরাতে কিংবা নিঝুম দুপুরেও বাবা এইভাবে কোমল নিখাদে ভায়োলিন বাজিয়ে স্মৃতি খুঁড়ে খুঁড়ে তাঁর বেদনাকে বার করে আনেন।

জয়া খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে শিবনাথের পেছনে গিয়ে ডাকে, 'বাবা—'

চমকে বাজনা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়াকে বুকের ভেতর টেনে নেন শিবনাথ। একটু পর দুজনেই টের পায় তারা কাঁদছে। চন্দ্রাকে ভুলে যেতে পারে নি শিবনাথ।

জয়া যেমন বাবার সব কিছুই জানে, শিবনাথের কাছেও জয়ার সব কিছুই জলের মতো স্বচ্ছ।

ওদিকে সাধনা দূরে চলে গেলেও সম্পর্কটা ছিঁড়ে যায় নি। সাধনাদের অফিসে পাঁচ দিন ওয়ার্কিং ডে। শনি আর রবি ছুটি। চান্দেলিতে যাবার পর শুক্রবার বিকেলে অফিস ছুটি হলে এক সেকেণ্ডও দেরি করে না সাধনা। দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে লং ডিসট্যান্স রুটের বাস ধরে বম্বে চলে আসে। শনি রবি দু-দিন জয়াদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ভোরে শেয়ারের ট্যাক্সিতে কি ডেকান কুইনে চান্দেলিতে ফিরে যায়। বছরের পর বছর এভাবেই চলে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে জয়াকে তার সঙ্গে ছুটি কাটাবার জন্য যেতে বলে সাধনা। দু-একবার জয়া গেছেও কিন্তু একটা রাত কাটতে না কাটতেই বম্বে ফিরে এসেছে। শিবনাথ তার ওপর বড় বেশী নির্ভরশীল। তাঁকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে না। বাবার ছায়ায় ছায়ায় সেই ছেলেবেলা থেকে সে বেড়ে উঠেছে। শিবনাথের কাছে কাছে থাকাটা জয়ার পক্ষে একটা অভ্যাসের মতো। অভ্যাস কি রাতারাতি বদলানো যায়? আসলে বাবাকে ছাড়া আর কিছুটা ভাবতে পারে না জয়া। শিবনাথ ফিক্সেসানের মতো তার মাথায় আটকে গেছে।

যাই হোক, চান্দেলি থেকে বম্বে, বম্বে থেকে চান্দেলি—প্রতি উইক-এণ্ডে, ছোটাছুটি করতে করতে কবে যে আগেকার ছিপছিপে পাতলা গড়ন ভেঙেচুরে সাধনার চেহারা ভারিক্কি হয়ে উঠেছে, কবে যে একটি দুটি করে মাথার সিকি-ভাগ চুল রুপোর তার হয়ে গেছে, চোখে বাইফোকাল লেন্সের পুরু চশমা

উঠেছে, টের পাওয়া যায় নি। তবে জীবনের লম্বা দৌড় শেষ করে আনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক দায়-দায়িত্বও তার শেষ হয়েছে। চান্দেলিতে যাবার পরই মা মারা গিয়েছিলেন। তারপর এই ক'বছরে ভাইদের মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চাকরি-বাকরি নিয়ে তাদের কেউ কলকাতায়, কেউ দিল্লীতে, কেউ বা ব্যাঙ্গালোরে। বোনেরাও বিয়ে হয়ে দূরে দূরে চলে গেছে। সাধনার কাছে এখন কেউ নেই। সে একেবারে একা। সংসারের জন্য জীবনের সব চাইতে সেরা ফলবান অংশটা তার নষ্ট হয়ে গেছে। উইক-এণ্ডে চান্দেলি থেকে এক-বার করে বোম্বাই ছুটে আসা ছাড়া তার কাছে আর কোন আকর্ষণ নেই।

এইভাবেই চাকার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বছর দুই তিন আগে সেই ঘটনাটা ঘটল।

ট্রাভেল এজেন্সিতে একটা বড় কাজ হল, ক্লায়েন্টদের জন্য প্লেনের সীট বুক করা। এর জন্য নানা এয়ার লাইনসের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। বড় বড় অফিসার থেকে শুরু করে বুকিং ক্লার্ক পর্যন্ত সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না রাখলে নিজের কাজটি বার করে আনা যায় না। অবশ্য এয়ার লাইনসগুলোও ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রেখে চলে। এতে তাদেরও স্বার্থ রয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলো খদ্দের যোগাড় করে আনলে তাদের টিকেট বিক্রি বাড়ে। আসলে স্বার্থটা পারস্পরিক।

একদিন দুপুরবেলা দুবাইয়ের একটা টিকেটের জন্য অজয়দের এয়ার লাইনসে ফোন করেছিল জয়া। তখন অবশ্য অজয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয় নি, এমন কি তাকে ছাখে নি পর্যন্ত।

অজয়দের এয়ার লাইনসে ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার ছিলেন মিস্টার রেখী। রেখীর সঙ্গে জয়ার পরিচয় ছিল, তার গলার স্বর শুনলেই চিনতে পারত। কিন্তু সেদিন ফোন করতে গিয়ে অন্য গলা ভেসে এসেছিল। জয়া একটু অবাক হয়ে বলেছিল, 'আমি কমার্শিয়াল ম্যানেজার মিস্টার রেখীকে চাইছি।'

ওধার থেকে সেই গলাটি আবার শোনা গিয়েছিল, 'আমিই ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার। তবে রেখী নই।'

'আপনি?'

'আমি অজয়—অজয় শর্মা। মিস্টার রেখীর জায়গায় এসেছি।'

দশ বারো দিন আগেও রেখী সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে জয়ার। তখনও জানতে পারে নি মিস্টার রেখী এখান থেকে চলে যাবেন। একটু অবাক হয়েই সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'রেখী সাহেব কি ছুটিতে গেছেন?'

অজয় বলেছিল, 'হ্যাঁ' ছুটির পর উনি আমাদের ক্যালকাটা অফিসে জয়েন করবেন। রেখী সাহেবের সঙ্গে কি আপনার পার্সোনাল কোন দরকার ছিল?'

জয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'না-না, অ্যাবসোলুটলি অফিসিয়াল।'

'তা হলে আমাকে বলতে পারেন।'

জয়া তার ট্রাভেল এজেন্সির নাম করে দরকারের কথাটা জানিয়েছিল। অজয় দু মিনিটের মধ্যেই তাদের মিডল ইস্টের দিকের প্রথম ফ্লাইটে ডুবাইয়ের একটা সীট কনফার্ম করে জয়াকে জানিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আপনাদের যখন যা দরকার হবে, আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস।'

'ধন্যবাদ।'

এর দু দিন বাদেই আবার ফোন করতে হয়েছিল। বাহেরিন আর কুয়েতের জন্য চারটে চারটে মোট আটটা সীট দরকার। সীটের ব্যবস্থা করে অজয় বলেছিল, 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, খুব সম্ভব দু দিন আগে আপনিই ফোন করেছিলেন।'

জয়া বলেছিল, 'একবার গলা শুনেই মনে করে রেখেছেন।'

'ওটা আমার একটা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন বলতে পারেন। আমার কান দুটো খুব সেনসিটিভ। যাক গে, নিজের সার্টিফিকেট নিজে আর না-ই দিলাম। কিন্তু যাঁর সঙ্গে দু দিন এত কথা বলছি তাঁর নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারি নি।'

ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলে তবু ভালোই লাগছিল জয়ার। সে বলেছিল, 'আমার নাম জয়া ব্যানার্জী।'

'আপনি বাঙালী!' অজয়ের গলায় চমক খেলে গিয়েছিল যেন।

'হ্যাঁ।' একটু চুপ করে থেকে দ্বিধান্বিত ভাবে উত্তর দিয়েছিল জয়া।

যদিও বাঙালী বাবার মেয়ে সে, সেই মূহূর্তে সিন্ধী মায়ের কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ ইংরেজিতেই কথা হচ্ছিল। এবার পরিষ্কার বাঙলায় অজয় বলেছিল, 'আগে জানলে বাঙলাতেই কথা বলা যেত। ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে কি সুখ হয়!'

জয়া অবাক হয়ে বলেছিল, 'আপনি কি বাঙালী?'

'ফিফটি পারসেন্ট বলতে পারেন। আমার মা-বাবা ইউ-পির লোক। তবে আমার জন্ম কলকাতায়। ওখানেই পড়াশোনা করেছি, বড় হয়েছি। নানা ফার্মে চাকরি ক'রে এখন যে এয়ারলাইনসে কাজ করি তার ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে চাকরি পেয়েছি। একটানা পাঁচ বছর কাজ করার পর অথরিটি এবার আমাকে বম্বেতে ট্রান্সফার করেছে।'

এরপর থেকে কাজের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই অজয় ফোন করত। তখনও কেউ কাউকে দ্যাখেনি। তবে কথায় বার্তায় অজয়কে বেশ স্মার্ট, ঝকঝকে, আমুদে আর প্রাণবন্ত মনে হত জয়ার।

দু-তিন মাস বাদে একদিন কথায় কথায় অজয় বলেছিল, আমরা কি চিরকাল টেলিফোনেই গল্প করে যাব? কোন দিন দেখাটেখা হবে না?

অজয় সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল ছিল জয়ার, তাকে দেখতেও ইচ্ছে করত। কিন্তু সে কথা একটি মেয়ের পক্ষে বলাটা ভালো দেখায় না। কিন্তু অজয় যখন নিজের থেকে দেখা করতে চাইল জয়া খুশী হয়ে উঠেছিল এবং উত্তেজনাও অনুভব করেছিল। রাস্তা দিয়ে চলতে ফিরতে কত যুবকই তো তাকিয়ে থাকত, হয়ত আলাপও করতে চাইত। কলেজে পড়বার সময় সীনিয়ার ক্লাসের ছেলেরা এবং দু-একজন অল্প বয়সের ছোকরা অধ্যাপক তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে জয়ার কোন রকম উৎসাহ ছিল না। বাবা যেন চারদিকে শক্ত একটা ফ্রেম তৈরী করে তার ভেতর জয়াকে পুরে দিয়েছিল। সেই ফ্রেমটা ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অথচ যে অজয়কে জয়া তখন পর্যন্ত চোখে দেখেনি তারই জন্য অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছিল। আস্তে করে সে তাকে বলেছিল, 'আপনি চাইলেই দেখা হবে। আমার কোন আপত্তি নেই।

অজয় খুশিতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আমার মতো নাকি লোক এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডে আর একজনও নেই।'

অজয়ের বালকের মতো উচ্ছাস দেখে হেসে ফেলেছিল জয়া, 'তাই নাকি! ফ্ল্যাটারি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

'একেবারেই না ম্যাডাম। ইটস এ ফ্যাক্ট। এখন আসল কাজের কথায় আসা যাক। কোথায় কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'আপনিই বলুন।'

'ছুটির পর আপনার অফিসে চলে যাব? দয়া করে একটু ওয়েট করবেন?'

'প্লীজ এখানে আসবেন না—'

জয়ার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করে অজয় বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলে কলীগরা জ্বালিয়ে মারবে, তাই না? জয়া চমকে উঠেছিল। ঠিক এই কথাটিই সে ভেবেছে। কিন্তু অজয় কি করে টের পেল? খড়ি পেতে কারা যেন ভূ-ভারতের খবর বলে দেয়, অজয় কি কোন বিদ্যা জানে! জয়া আধফোটা গলায় বলেছিল, 'মানে—'

'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। এক কাজ করুন। ছুটির পর গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার ঠিক নিচে ওয়েট করবেন। ভালো কথা, আপনি কি রঙের শাড়ি পরেছেন আজ?

'মেরুন রঙের। কেন বলুন তো।

'বা আপনাকে চিনে বার করতে হবে না? মেরুন শাড়ি হবে আপনার আইডেন্টি কার্ড।'

জয়া মজা করে বলেছিল, 'আপনার কি ধারণা গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার তলায় আপনাকে রিসিভ করার জন্য মেরুন শাড়ি পরে শুধু একটি মেয়েই ওয়েট করবে? আরো কিছু মেয়েও তো ঐ রঙের শাড়ি পরে আসতে পারে।'

অজয় বলেছিল, 'হোল বম্বে সিটির সব মেয়ে যদি মেরুন শাড়ি পরে আসে আমি আসল মেয়েটাকেই খুঁজে নেব।'

সত্যি সত্যিই গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ায় এসে জয়াকে বার করে ফেলেছিল অজয়। ওখানেই সমূদ্রের পাড় ধরে গল্প করতে করতে দুজনে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েছিল।

সেদিনের সেই বিকেল বেলাটা ছিল আসলে সুন্দর। মাথার ওপর নীল ছাতার মতো প্রকাণ্ড আকাশ, নিচে নীল আয়নার মতো সমুদ্র। চারপাশে অসংখ্য মানুষ। পেছনে তাজমহল হোটেলের বিশাল বাড়ি; তার গায়ে নতুন ইন্টার-কন্টিনেন্টাল অ্যানেক্স। সামনে সমুদ্রের পাড় থেকে একটার পর একটা মোটর বোট টুরিস্টে বোঝাই হয়ে তীরের মতো এলিফ্যান্টা কেভের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

বেড়াবার পর একটা রেস্তোরাঁয় ওরা চা খেয়েছিল। চা খাওয়া, গল্প করা আর বেড়াবার ফাঁকে কখন যে দেড় দু ঘণ্টার মতো সময় কেটে গেছে, টের পাওয়া যায় নি। যখন জয়ার খেয়াল হল, পৌনে সাতটা বাজে। সেই মুহূর্তে বাবার মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল তার। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিল জয়া। এর আগে অফিস ছুটি হলে এক সেকেণ্ডও আর দেরি করত না সে। একরকম ছুটতে ছুটতে চার্চ গেট স্টেশনে গিয়ে সান্তাক্রুজের ট্রেন ধরত। জয়া বলেছিল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

এত তাড়াতাড়ি জয়া চলে যাবে, অজয় ভাবে নি। সে বলেছিল, 'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও ভালো করে সন্ধ্যে হয় নি। এত তাড়া কিসের? বসুন না আরেকটু '

জয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছিল, তার পক্ষে আর থাকা সম্ভব না।

অজয় জয়াকে আটকায় নি। চার্চগেট পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল।

জুহুতে ফেরার পর শিবনাথ জিজ্ঞেস করেছিলে, 'কি রে, তোর আজ এত দেরি হল? রোজ ছ'টা সাড়ে ছ'টার ভেতর চলে আসিস। আজ আটটা বেজে গেল। আমার ভীষণ ভাবনা হচ্ছিল।'

জয়া বাবার দিকে তাকাতে পারছিল না। মুখ নিচু করে কোনরকমে জড়ানো গলায় বলেছিল, 'অফিসে বেশি কাজ ছিল। সারতে সারতে দেরি হয়ে গেল।' বলেই সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। শিবনাথের কাছে জীবনে সেই তার প্রথম মিথ্যে বলা।

বাবার সঙ্গে অজয়ের ব্যাপারে সেই যে লুকোচুরিটা শুরু হয়েছিল সেটা আর থামল না। কেননা অজয় তার পর থেকে প্রায় রোজই অফিস ছুটির পর কিংবা দুপুরে লাঞ্চের সময় তাকে বাইরে কোথাও—হয়তো কুপারেজ মাঠের কাছে কিংবা ওভালে অথবা ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের সামনের দিকে বিশেষ কোন জায়গায় দাঁড়াতে বলত। জয়া গিয়ে দাঁড়ালে দু মিনিটের মধ্যে অজয় এসে তাকে সঙ্গে করে কোন রেস্তোরাঁয় চলে যেত। এক আধদিন অফিস পালিয়ে তারা যেত এলিফ্যান্টা কেভে, বোরিভিলির ন্যাশনাল পার্কে কিংবা আরে মিল্ক কলোনির বাগানে বা মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে। কিন্তু যতই গল্প করুক, যতই ঘুরুক, সেই প্রথম দিনটার মতো আর কখনও বাড়ি ফিরতে দেরি করে নি জয়া। সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে রোজই ফিরে এসেছে।

সুতোয় পাথরকুচি বেঁধে আঙুলে জড়িয়ে ঘোরালে যেমন একটি বৃত্ত তৈরি হয় জয়া যেন অনেকটা সেই রকম। সে ঘুরছে ঠিকই কিন্তু অদৃশ্য আঙুলের টান ছিঁড়ে কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারছিল না।

বার কয়েক দেখা হওয়ার পর অজয় আর জয়া পরস্পরের অনেক কাছে চলে এসেছিল। অজয় খুবই খোলামেলা ছেলে। তার কোন কিছুই গোপন নেই। প্রথম দিনই গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে যখন দেখা হয়েছিল সেদিনই আধ ঘণ্টার মধ্যে নিজের লাইফ হিস্ট্রি, ঠাকুরদা থেকে শুরু করে সে পর্যন্ত তিন জেনারেসনের পারিবারিক ইতিহাস গলগল করে বলে ফেলেছিল। আলাপটা আরেকটু গাঢ় হতে ওদের কোলাবার ফ্ল্যাটে মাঝে মধ্যে জয়াকে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। জয়া অবশ্য প্রথম দিকে যেতে চাইত না; খুব সঙ্কোচ হত। কিন্তু অজয় জোরজার করে নিয়ে যেত। পরে অবশ্য সঙ্কোচটা কেটে গিয়েছিল জয়ার।

অজয়ের বাবা নেই। কোলাবায় কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে মাকে নিয়ে থাকে সে। অজয়ের মা মানুষটি এক কথায় চমৎকার। ছোটখাটো গোলগাল জাপানী পুতুলের মতো; খুবই স্নেহপ্রবণ। অনেক কাল কলকাতায় থাকার জন্য জলের মতো বাঙলা বলতে পারেন। জয়া গেলে তিনি ভারী খুশী হন; তাঁর দু চোখে যেন স্নেহ চলকাতে থাকে। জয়াকে নিজের কাছে বসিয়ে ঘরে

তৈরি নানারকম খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে প্রচুর গল্প করে যান। তাঁর গল্পের বেশির ভাগ জুড়েই থাকে তাঁর দুই ছেলে। ছোট ছেলে অজয়ের কাছে বারো মাস তাঁকে পড়ে থাকতে হয়। বড় ছেলে বিজয়, তার বউ এবং নাতি-নাতনীরা তাদের কাছে যাবার জন্য মাদ্রাজ থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ট্রাঙ্ককল করে কিন্তু অজয়কে একলা ফেলে কোথাও কি যাবার জো আছে! তিনি না থাকলে অজয়ের ঠিকমতো খাওয়াই হবে না। যা অন্যমনস্ক খামখেয়ালী অগোছালো ছেলে! কোন দিকেই হুঁশ নেই। সর্বক্ষণ এটা হারাচ্ছে, ওটা হারাচ্ছে। ওকে রেখে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই।

মাকে নিয়ে অজয় আর দাদা বিজয়ের মধ্যে দারুণ খুনসুটি। অজয় নাকি দাদাকে বলে, 'যতক্ষণ না বিয়ে করছি ততক্ষণ তুমি মায়ের ভাগ পাচ্ছ না। এখন মায়ের পুরোটা আমার ভাগে। বিয়ের পর তোমার ফিফটি, আমার ফিফটি।'

অনেক বলে বলেও বা জোরাজুরি করেও অজয়ের মা ছেলের বিয়ে দিতে পারেন নি। ঘরে একটা বউ আনতে পারলে তার জিম্মায় অজয়কে রেখে একটু-আধটু তিনি বেরুতে পারেন। তা না, ছেলেটা তাঁকে একেবারে খাঁচায় আটকে ফেলেছে। অবশ্য এই খাঁচাটা যে তাঁর খুব অপছন্দ নয়, বরং বেশ লোভনীয়ই, সেটা তাঁর চোখমুখ দেখে টের পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে এক আধদিন তিনি জানিয়েছেন অজয়কে বিয়ের কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কথাটা সে কানেই তোলে না। অজয়ের মা আবার বলেছেন, বড় ছেলে তো নিজের জাতের বা দেশের মেয়ে বিয়ে করে নি, পছন্দ করে মাদ্রাজী মেয়ে বিয়ে করেছে। আজকাল আর জাতের বাছাবাছি নেই। অজয়ও যদি তার মনোমতো কোন মেয়েকে বিয়ে করে তিনি আপত্তি করবেন না।

কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে জয়া তা বুঝেছে কিন্তু এর উত্তর দেবার কথা তার নয়।

যাই হোক, শুধু নিজেদের কথাই বলেন না অজয়ের মা। জয়ার সম্বন্ধেও অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছেন। জয়া ভাসাভাসা ভাবে তাকে জানিয়েছে জুহুর এক ওনারশিপ ফ্ল্যাটে সে তার বাবার সঙ্গে থাকে। তার কোন ভাই বোন নেই। মায়ের সঙ্গে বাবার বনিবনা হয় নি বলে অনেকদিন আগেই ছাড়াছাড়ি

হয়ে গেছে। ব্যস, এইটুকুই। এর বেশি আর কিছু বলে নি। অজয়ের মা-ই না ; অজয়ও জয়ার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে পারে নি।

এভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর অজয় একদিন হাজি আলির কাছে সমুদ্রের পাড়ে বসে বলেছিল, 'অফিসে ফ্রেঞ্চ লিভ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কি চৌপাট্টির বীচে মুখোমুখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে আর কি ভালো লাগছে। আফটার অল আমাদের বয়স হচ্ছে। উই আর এজিং ; কলেজ-গোয়িং ছেলেমেয়ে নই।'

জয়া চুপ করে ছিল। তারও এভাবে সময় কাটাতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু করেই বা কী ?

অজয় এবার বলেছিল, 'ভাবছি দু-একদিনের মধ্যে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।'

জয়া চমকে উঠেছিল, 'কেন ?'

'বা রে, ভদ্রলোকের একটা পারমিসান নিতে হবে না !' অজয় এবার বেশ মজা করেই হেসে হেসে বলেছিল।

জয়া বুঝতে পেরে শিউরে ওঠার মতো করে বলেছিল, 'না-না, প্লীজ তুমি বাবার কাছে যেও না।'

'কেন !' অজয় খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'বাবাকে আমি কিছু জানাতে চাই না।'

'তা হলে ফাইনাল ব্যাপারটা হবে কি করে ? আফটার অল উনি তোমার ফাদার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যতই যা করো, তিনি ফাইনাল হুইসিলটি না বাজালে লাইফের দৌড়টা কিছুতেই স্টার্ট করতে পারবে না দাগের এপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

দু-হাতে মুখ ঢেকে আবছা গলায় জয়া বলেছিল, 'আমার রিকোয়েস্ট, তুমি বাবার কাছে যেও না '

একটু চুপ করে থেকে অজয় এবার বলেছিল, 'এদিকে আমার মা-ও এ ব্যাপারটায় ভীষণ প্রেসার দিচ্ছেন।'

মুখ থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে সোজা হয়ে বসেছিল জয়া। বলেছিল, 'আমাদের কথা মা জেনে ফেলেছে নাকি ? তুমি বলেছ ?'

'বলার দরকার হয় নি। ফাদার এবং মাদারেরা আমাদের চাইতে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে ওয়ার্ল্ডে এসেছে। অতগুলো বছরের এক্সট্রা সারপ্লাস এক্সপীরিয়েন্স ওদের ; ছেলেমেয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সব টের পেয়ে যায়।'

জয়া উত্তর দেয় নি।

অজয় বলেছিল, 'তোমার বাবাকে জানানো চলবে না। তা হলে এখন কী করা উচিত ?'

জয়া বলেছিল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অজয় হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'তোমার কি ধারণা আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার বাবা অপত্তি করবেন ? আই মীন তোমরা বাঙালী, আমরা ইউ-পির লোক—'

'না-না, বাবার সে রকম কোন প্রেজুডিস নেই। নিজেও তো তিনি অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। আমার মা সিন্ধী।'

'তা হলে অসুবিধাটা কী ?'

অসুবিধাটা যে কী, জয়া তা জানে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা যায় না। সে শুধু বলেছিল, 'আছে।'

অজয় বেশ খানিকক্ষণ পর বলেছিল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয় ?'

'কী ?'

'ধর আমরা ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে এখন বিয়েটা করে রাখলাম। পরে তুমি যখন বলবে, তোমার বাবাকে জানানো হবে।'

'বিয়ে করলেই তো আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে চাইবে।'

'নেভার। তুমি যখন বলবে তখনই নিয়ে যাব। তার আগে আমার দিক থেকে কোন প্রেসার দেওয়া হবে না। ওয়ার্ড অফ অনার।'

জয়া এবার একটু রগড়ের গলায় বলেছিল, 'বিয়ে করবে অথচ বউ কাছে থাকবে না, তেমন বিয়ে করে কী লাভ ?'

অজয় তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'পুরুষদের একটা সিক্রেট তোমাকে বলে দিই।'

'কী ?'

'সেন্স অফ পজেসান। যতক্ষণ না সে তার ডিয়ারেস্টকে বা প্রিয়তম মানুষটিকে দখল করতে পারছে ততক্ষণ তার পীস নেই। বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। তারপর যখন তোমার ইচ্ছা হবে আমার কাছে এসো। ম্যারেড লাইফটা না হয় কিছুদিনের জন্য ডিলেডই হবে। আমি প্রস্তুত।'

জয়ার দ্বিধা কাটে নি। সে বলেছিল, 'আমাকে কয়েক দিন ভাবতে দাও।'

'অল রাইট।'

এর পর আরো কয়েক মাস কেটে গেছে। শেষ পর্যন্ত অজয়ের কথাই মেনে নিয়েছে জয়া। আপাতত তারা বিয়েটা করে রাখবে। পরে একটা আবহাওয়া তৈরি করে শিবনাথকে সব জানানো হবে। সেই অনুযায়ী ওরা মেরিন লাইনসে গিয়ে আব্রাহাম সাহেবের কাছে বিয়ের নোটিশ দিয়ে এসেছে। কিন্তু বিয়ের তারিখে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সই করতে গিয়ে তার হাত কেঁপে গিয়েছিল। বিয়েটা হয় নি। তারপর আবার তারা নোটিশ দিয়েছিল, সেবারও ফর্মে নিজের সই দিতে পারে নি জয়া। শেষ মুহূর্তে তার এই দ্বিধার কারণ বার বার জানতে চেয়েছে অজয়। জয়া বলেছে পরে এক সময় জানাবে। অজয় আমুদে প্রাণবান ছেলে তা বটেই, খুব ভদ্র এবং মার্জিত ; জানার জন্য সে কখনও জোর করে নি। কবে জয়া বলবে সে জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আজ তৃতীয় বার বিয়ে করতে গিয়ে ফিরে এসেছে জয়া। সে জানে না, নিজের ভেতরকার দ্বিধা পেরিয়ে কোনদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সই করতে পারবে কিনা।

কতক্ষণ সমুদ্রের দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল, জয়ার খেয়াল নেই। হঠাৎ সাগরপাখিদের চিৎকারে চমকে উঠল সে। দেখল, হাজার হাজার সী-গল গলানো রুপোর মতো টলটলে তরল জ্যোৎস্না ডানায় মেখে সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।

এখন কত রাত, কে জানে। জুহুর বিশাল বেলাভূমি থেকে শুরু করে চারদিকের বিরাট বিরাট স্কাইস্ক্রেপার, নারকেল বন, অ্যাসফাল্টে মোড়া রাস্তা, ফ্লাইং ক্লাবের টাওয়ার—সব যেন ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

জয়া আস্তে আস্তে তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

সাত

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল, সবে রোদ উঠতে শুরু করেছে। পেঁজা তুলোর মতো আকাশের ছড়ানো-ছিটানো মেঘ আর 'বীচের' নারকেল-গাছগুলো সোনার জলে আঁকা কোন জাপানী ছবির মতো দেখাচ্ছে।

জয়া তার বিছানায় উঠে বসল। পরক্ষণেই তার চোখ গেল উল্টোদিকের 'কটটায়'। সাধনা সেখানে নেই। তার মানে আগেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে।

এ ঘরেই ড্রেসিং টেবলের কাছে জয়ার টুথ ব্রাশ আর পেস্টের টিউব থাকে। খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকার পর টিউব থেকে ব্রাশে পেস্ট নিয়ে পেছনের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো জয়া। সকালবেলা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে তার খুব ভালো লাগে।

এর মধ্যেই তাদের এই বিশাল কুড়িতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজটার ঘুম ভেঙে গেছে। ও ধারে জুহু 'বীচে' এখন প্রচুর লোকজন। এই সব স্বাস্থ্যান্বেষীরা বাদামী বালির ওপর মাইলের পর মাইল হেঁটে ভোরের সামুদ্রিক বাতাস থেকে ফুসফুসে টাটকা 'ওজোন' টেনে নিচ্ছে।

দাঁত মাজতে মাজতে হঠাৎ জয়ার চোখে পড়ল শিবনাথ আর সাধনা 'বীচে'র ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছেন। তার মনে পড়ল সাধনা মাসী চান্দেলি থেকে এখানে এলে বাবার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলেন না বা বাবাও প্রগলভ হয়ে ওঠেন না। বেশির ভাগ সময়ই বাবার ঘরের ব্যালকনিতে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দু-জনে চুপচাপ বসে থাকেন। তখন মনে হয়, দু-জনে যেন অপার্থিব কোন কিছুর মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। নইলে জুহুর নরম বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকেন।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা আর সাধনা মাসীকে দেখল জয়া। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে চলে গেল। তার এখন অনেক কাজ। সাধনা মাসী আছেন, তাই রান্নাবান্নাটা তাকে করতে হবে না কিন্তু রান্নার ব্যাপারে সাধনা মাসীকে এটা ওটা এগিয়ে তো দিতে হবে।

স্নান করে বাইরে বেরিয়ে জয়া সাধনা মাসী আর বাবা 'বীচ' থেকে ফিরে এসেছেন। বাবার জন্য গ্যাসের উনুনে রুটি সেঁকে ছানা তৈরি করে ফেলেছেন সাধনা মাসী। জয়া এবং নিজের জন্য ডিমের পোচ আর টোস্ট করে এখন পট থেকে কাপে কাপে চা ঢালছেন।

ডাইনিং টেবলে বসেই তিন জনে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। তারপর বাবাকে ওষুধ খাইয়ে সাধনা মাসী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রান্না হবে রে।'

জয়া বলল, 'ফ্রীজে মাছ আছে। আর সবজি-টবজি অনেক রয়েছে। তুমি যা ভালো হয় করো।'

'তুই মাছ আর সবজি কেটে-কুটে দে। আমি ভাত চড়িয়ে দিই।'

'আচ্ছা।'

এই ফ্ল্যাটের কোথায় কী আছে, সাধনা জানেন। তিনি চাল ডাল বার করে ধুয়ে-টুয়ে দুটো গ্যাসের উনুনে বসিয়ে দিলেন। মাছটাছ কেটে সাধনার হাতের কাছে রেখে একটা ছুরি দিয়ে আলু-পটল-পেঁয়াজ কাটতে লাগল জয়া।

বাবার কাছে ছাড়া অন্য সময়টা চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না সাধনা। ডাল-ভাত বসিয়েই একফালি কাপড় দিয়ে তিনি ডাইনিং স্পেসের দরজা জানলা মুছে ফেললেন। তারপর ধরলেন ফ্রিজটা। উইক-এণ্ডে একবার এসে এই ফ্ল্যাটের প্রতিটি ঘর এবং যাবতীয় জিনিসপত্র বড় যত্নে এবং মমতায় ঝেড়ে-পুঁছে আয়নার মতো ঝকঝকে করে দিয়ে যান।

আনাজ কাটতে কাটতে সাধনাকে দেখে যাচ্ছিল জয়া। এই মহিলাটিকে তার ভারি আশ্চর্য লাগে। কত বছর ধরে শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, চান্দেলি থেকে প্রতিটি উইক-এণ্ডে তিনি এখানে আসছেন। দু দিনের মতো থাকেন সাধনা মাসী। এর মধ্যে রান্না করে, ঘর গুছিয়ে, ফ্রিজ মুছে, জয়া এবং শিবনাথকে খাইয়ে নিজের হাতে বিচিত্র টুকরো সংসার গড়ে তোলেন। এটুকুর জন্য তাঁর বড় মায়া, বড় টান। শুধু এটুকুর জন্যই বছরের পর বছর তিনি চান্দেলি থেকে ছুটে আসছেন।

একেক সময় জয়ার মনে হয়েছে, বাবার সঙ্গে কবেই তো মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সাধনা মাসীরও তো কেউ নেই। পরস্পরকে ওঁরা ভালোবাসেন, যদিও বাইরের দিকে তার প্রকাশ নেই। সাধনা মাসী যদি চিরকালের জন্য

তাদের কাছে চলে আসত, বড় ভালো হতো। কিন্তু সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করার পর চুলে যখন অদৃশ্য মেকআপ ম্যান রুপোলি ব্রাশ টেনে দিয়েছে তখন সাধনা মাসী বোধ হয় সে কথা আর বলতে পারেন নি। এতকাল বলা হয় নি বলেই হয়ত আর বলতে পারছেন না। বাবার দিক থেকেও কোথায় যেন কী একটা আটকে আছে। খুব সম্ভব 'বলব বলব' করেও তিনিও সাধনা মাসীকে কিছু বলেন নি। ফলে সাধনা মাসী সপ্তাহে দু দিন জুহুতে এসে সংসারের মায়াবী খেলা খেলে যাচ্ছেন। এটাই যেন একটা নিয়ম বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাধনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ে গেল জয়ার। তার বিয়েটা বিরাট এক দ্বিধার মাঝখানে আটকে আছে। যদি ওটা হয়ে যায়ও, অজয়দের বাড়িতে গিয়ে সে থাকতে পারবে না। সাধনা মাসীর মতোই কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়ে একটু মায়াবী খেলা খেলে আসতে হবে, হঠাৎ জয়ার মনটা ভারী বিষাদে ছেয়ে যেতে লাগল।

ফ্রিজ মোছা হয়ে গেলে আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সাধনা মাসী জয়ার মুখোমুখি একটা চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, 'আজ তোকে অফিসে যেতেই হবে?'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন বল তো?'

'আমি থেকে যাচ্ছি! তুই ছুটি নিয়ে বাড়ি থাকলে ভালো লাগত।'

পলকের জন্যে অজয়ের মুখটা মনে পড়ে গেল জয়ার। কাল রাত্তিরে করুণ মুখ করে সে তাকে চার্চগেট স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এক বার দু-বার না, তিন তিন বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়ের কাগজপত্র সই না করেই ফিরে এসেছে। আজ অজয়ের সঙ্গে দেখা করে জয়া তার অসহায়তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব হয়, একবার কোলাবায় গিয়ে অজয়ের মায়ের সঙ্গেও দেখা করে আসবে। তিনি সব ব্যাপারটা জানেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসা দরকার। তা ছাড়া অফিসেও প্রচুর কাজ পড়ে আছে। এই সময়টা প্রচুর টুরিস্ট আসে বম্বেতে। তাছাড়া এখানকার লোকদেরও বাইরে যাওয়ার হুজুগ পড়ে যায়। দিন দিন তাদের ক্লায়েন্ট বাড়ছেই। ফলে এত কাজের প্রেসারের মধ্যে অফিস কামাই

করা কোনমতেই সম্ভব না। জয়া বলল, 'না মাসী, আজ আর ছুটি নেওয়া যাবে না। কাল অনেক কষ্ট করে ম্যানেজ করেছিলাম।'

'তা হলে আর কী করা; অফিসেই যা। তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।'

'আচ্ছা।'

'সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা?'

'কাল রাত্তিরে কী বলেছিলি?'

জয়ার মনে পড়ে গেল। সে কাউকে ভালোবাসে কিনা এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন সাধনা মাসী। জয়া বলল, 'বলেছি তো তোমাকে বলব—' এই ব্যাপারটা নিয়েও অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সাধনা মাসী বললেন, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

জয়া একটু ভেবে বলল, 'তুমি কিন্তু তোমার অফিসে ছুটির জন্যে ফোন করবে।'

'মনে আছে। দশটা বাজুক; অফিস খুললে তবে তো ফোনটা করব। এখন আর কাকে পাবো।'

আজ আর শিবনাথের জন্য ব্যস্ত না হলেও জয়ার চলবে। সাধনা মাসী আছেন; তিনিই বাবার দিকটা দেখবেন। উইকএণ্ডে সাধনা মাসী চান্দেলি থেকে এলে বাবার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় জয়া।

আরো এক ঘণ্টা বাদে খেয়েদেয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়ল জয়া। তাদের ফ্ল্যাটের সামনে প্যাসেজ ধরে লিফট-বক্সের কাছে আসতেই দেখা গেল পাইলট ফ্লেচার, তার গাবদা-গোবদা রক্ষাকালী মার্কা বউ এলসা, এবং পর পর দুই ইঞ্চি করে ছোট কালো কালো একগাদা ছেলেমেয়ে দারুণ সেজে দাঁড়িয়ে আছে। সাজগোজটা সব চাইতে বেশি করেছে এলসা। পুরু কালো ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক, গালে রুজ, কপালে সোহাগ বিন্দি, পরনে গাঢ় খয়েরি রঙের চক্কর-বক্কর লাগানো ম্যাক্সি, আট ইঞ্চি হিলের জুতো, মাথায় রুমাল। স্বামীর সঙ্গে দারুণ হেসে হেসে কথা বলছিলসে। এরাই যে কাল মাঝরাত পর্যন্ত তাদের ফ্ল্যাটে একটা মহাযুদ্ধের মহড়া দিয়েছিল তা যেন ভাবা যায় না।

অবশ্য জয়া মোটেই অবাক হয় নি। জুহুর এই অ্যাপার্টমেণ্ট হা উসে আসার পর থেকে দশ বছর ধরে একই দৃশ্য দেখে আসছে সে। আগের রাত্রিরে যদি এলসারা মারপিট করে তা হলে পরের দিন যত কাজই থাক, ফ্লেচার অফিসে যাবে না, বাচ্চারা স্কুল কামাই করবে এবং বাড়িতে উনুন ধরবে না। সকালবেলা গোটা ফ্যামিলি তাদের ওয়ার্ডরোব থেকে সব চাইতে দামী আর জমকালো পোশাক বার করে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়বে। সারাদিন বাইরে হৈ হৈ করে, হোটেলে খেয়ে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে ফিরে আসবে মধ্যরাতে। বেশ কয়েকটা দিন ফ্লেচার আর এলসাকে দেখে মনে হবে তারা যেন টীন-এজার প্রেমিক-প্রেমিকা। তারপর দুম করে একদিন আবার গলা পর্যন্ত ঠাররা বা কাজু-ফেনি গিলে আরক্ত চোখে টলতে টলতে ফ্ল্যাটের সামনের প্যাসেজে এসে শুয়ে থাকবে। তখন আবার যুদ্ধের ব্যাণ্ড বেজে উঠবে। লড়াই-এর পর ট্রিটি, তারপর চুটিয়ে ক'দিন প্রেম। সাইকেলের চাকা যেমন ঘুরে যায় তেমনি ওদের ঝগড়া, আর প্রেমও একটার পেছনে আরেকটা ঘুরে ঘুরে আসে. দশ বছর ধরে এই প্রোগ্রামের হেরফের হতে দ্যাখে নি জয়া। লাইফে যারা একই কনসার্ট বছরের পর বছর বাজিয়ে যেতে পারে তারা নিঃসন্দেহে সুখী। বেশ আছে ফ্লেচাররা।

একই বাড়িতে পাশাপাশি দশ বছর আছে জয়ারা। ফ্লেচারদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা না হলেও সম্পর্কটা মোটামুটি খারাপ না দেখা হলে ওরা হেসে কথা বলে, জয়া আর শিবনাথ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। বিজয়া দশমীর দিনে জয়ারা যেমন ওদের ফ্ল্যাটে মিষ্টি পাঠায়, ওরাও তেমনি এক্স-মাসে কেকের বাক্স দিয়ে যায়।

জয়াকে দেখে এলসা হাসল, 'অফিসে যাচ্ছ?'

জয়াও হাসল, 'হ্যাঁ।'

'কাজকর্ম কি রকম চলছে?'

'ভীষণ প্রেসার।'

'অত কাজ করে কী হবে? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবার একটা বিয়ে করে ফেল। ইটস হাই টাইম।'

দমকা বাতাস জয়ার বুকের ভেতর এলোমেলো ঢেউ তুলে দিয়ে গেল

যেন। সে উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'প্রথমে মাড আইল্যাণ্ডে। ওখান থেকে ফিরে হোটেলে খেয়ে এধারে ওধারে ঘুরব। সন্ধ্যেবেলা 'এরস' সিনেমায় হলিউডের একটা হাসির ছবি দেখে রাত্তিরে কোথাও ডিনার চুকিয়ে বাড়ি ফিরব।'

ফ্লেচার এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। এবার সে মুখ খুলল, 'তুমি তো জানোই কাল রাত্তিরে ফ্ল্যাটে গোলমাল করে ফেলেছিলাম। আজ তোমার আন্টিকে তাই ঘুষ দিতে হচ্ছে।' জয়া ফ্লেচার আর এলসাকে আঙ্কল-আন্টি বলে।

'ঘুষ!' ঝট করে স্বামীর দিকে ঘুরে গেল এলসা। হাত বাড়িয়ে তার চুলের ঝুঁটি ধরতে যাচ্ছিল। তার আগেই এক্সপার্ট ক্যারাটে খেলোয়াড়ের মতো চোখের পলকে মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে ফ্লেচার। অবশ্য মারদাঙ্গা করার জন্য আজ এলসা তার চুল ধরতে চায় নি। এটা তার ভালোবাসার প্রকাশ।

লিফট বক্সের পাশের দেয়ালে একেবারে সেঁটে গিয়ে হাতজোড় করে ফ্লেচার বলল, 'স্যরি, এক্সট্রিমলি স্যরি—পারডন '

এই সময় পাশাপাশি হুটো লিফট নিচতলা থেকে ওপরে উঠে এল। একটা বাক্সে ফ্লেচার, এলসা আর জয়া ঢুকল। আরেকটা বাক্সে ঢুকল ফ্লেচারের বাচ্চারা।

একমিনিটের মধ্যে লিফট হুটো গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এল। রাস্তায় এসে হুটো ট্যাক্সি নিল ফ্লেচাররা। জয়া যেদিকে যাবে তার একেবারে উল্টোদিকে যাবে ফ্লেচাররা। তবু ফ্লেচার বলল, 'উঠে এসো। তোমাকে সান্তাক্রুজ স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

জয়া হু হাত নেড়ে বলল, 'না না আঙ্কল, আপনারা চলে যান। আমার জন্যে অতটা ঘুরে যেতে হবে না।'

আরো হু একবার বলার পরও জয়া যখন ট্যাক্সিতে উঠতে রাজী হল না তখন ফ্লেচার বলল, ঠিক আছে, তা হলে আমরা চলি। পাশাপাশি থাকি অথচ অনেক দিন কিন্তু তুমি আমাদের ফ্ল্যাটে আসো নি।'

'আপনারাও তো আমাদের ওখানে আসেন নি।'

'ঠিক আছে, কালই তোমাদের ওখানে যাব। অনেক গল্প করব। তারপর কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটে তোমার রিটার্ন ভিজিট দেওয়া চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

'ফ্লেচাররা চলে গেল। জয়া রাস্তা পেরিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল।

আট

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে পৌঁছে গেল জয়া। দোতলায় পুরু কাঁচের দেয়াল-ঘেরা যে ঘরটায় সে বসে সেখান থেকে ফিরোজ শা মেটা রোডের অনেকটা দেখা যায়। তার ঘরের ডান পাশ থেকে কাঁচের ওয়ালে ঘেরা অন্যান্য কর্মীদের ঘর। সামনের দিক নিয়ে লম্বা করিডোর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেম্বার। তার পাশে কনফারেন্স রুম। সেটার গা ঘেঁষে কোম্পানির তিন জন ডাইরেক্টরের তিনটে চেম্বার।

কাল ছুটি নিয়েছিল জয়া। আজ তার ঘরে ঢুকে সে দেখল টেবিলের ওপর অনেকগুলো ফাইল জমা হয়ে রয়েছে। এগুলো কালকের ফাইল। এরপর আজকের ফাইল আসবে। তার মানে একটা সেকেণ্ড আর গড়িমসি করে কাটানো যাবে না।

জয়ার ঘরটা চমৎকার সাজানো। পেছনের দেয়ালের একধারে এয়ার-কুলার বসানো; মাঝখানে কাঠের সুদৃশ্য ওয়াল-ক্যালেণ্ডার। আধখানা বৃত্তের মতো গ্লাস-টপ টেবল তার, ফোমে মোড়া চেয়ার। পিন কুশন, এ্যাশ ট্রে, পেন-স্ট্যাণ্ড, টেবল-ক্যালেণ্ডার, টেলিফোন সব ঝকঝকে। ঘরের সামনের প্যাসেজে একটা টুলের ওপর সাদা ধবধবে ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা বসেছিল। জয়া তার চেয়ারে বসতেই ওয়াটার কুলার থেকে এক গেলাস জল এনে টেবলে ঢাকা দিয়ে রেখে গেল।

জয়া দু মিনিট চুপচাপ বসে থাকল। তারপর জলটা খেয়ে নিয়ে ফাইল খুলে বসল।

নিচে ফিরোজ শা মেটা রোডে এখন হাজার হাজার প্রাইভেট কার আর

ট্যাক্সি স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে ফুটপাতের ওপর দিয়ে অগুনতি মানুষের আগোছালো মিছিল। কাঁচের দেওয়াল বলে বাইরের শব্দ প্রায় আসছেই না। নিচের রাস্তাটা তখন সাইলেণ্ট যুগের কোন এক ছবির অংশ যেন।

ঘাড় গুঁজে কতক্ষণ কাজ করেছিল খেয়াল নেই। এক সময় মুখ তুলে রাস্তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল জয়া। একটা প্রকাণ্ড ইমপোর্টেড আমেরিকান গাড়ি তাদের অফিসের সামনে এসে পার্ক করল এবং দরজা খুলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল তার মা চন্দ্রা। এক সময়ে সে ছিল চন্দ্রা মালকানি, পরে চন্দ্রা ব্যানার্জি, এখন চন্দ্রা সিং। মায়ের সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন তাঁকেও চেনে জয়া। তিনি মায়ের দু নম্বর স্বামী গলফ প্লেয়ার কার্নাল সিং। জয়া জানে, ওরা তার কাছেই আসছে। নিশ্চয় বাইরে কোথাও যাবে, সেই জন্য এয়ার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

দু মিনিটের মধ্যেই ওরা জয়ার ঘরে এসে পড়ল। কার্নাল সিংয়ের বয়স পঞ্চাশের ওপারে কিন্তু এখনও তাঁর চেহারা বেতের মতো টান টান। মায়ের বয়সও পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, কিংবা বয়সের ওই মাইল স্টোনটা সে পেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই বয়সেও ফিগারটাকে তেইশ চব্বিশ বছরের কোন যুবতীর মতো টাটকা এবং তাজা রেখেছে।

ঘরে ঢুকেই সারা মুখ জুড়ে হেসে কার্নাল সিং দারুণ মিষ্টি করে বললেন, 'হাউ আর ইউ মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি—'

ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়া। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীকে কারো ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু কার্নাল সিংকে মনে মনে পছন্দ করে জয়া। সে বলল, 'ফাইন! প্লীজ বী সীটেড—'

ওরা বসলে জয়াও বসল। তারপর বলল, 'কেমন আছেন আপনারা?'

'ফার্স্ট ক্লাস।'

'এবার অনেক দিন পরে এলেন।'

'হ্যাঁ, নানা কাজে এমন জড়িয়ে ছিলাম যে আসতে পারি নি।'

'চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবার কী খবর?'

জয়া বলল, 'নাথিং নিউ। যেমন চলছিল তেমনই চলছে।'

জয়া আর শিবনাথের মোটামুটি সব খবরই রাখে চন্দ্রা। সে বলল, 'তোর বাবা সং রেকর্ডিং-এ রেগুলার বাজায়?'

'হ্যাঁ।'

'সেই মেয়েটা, আই মীন সাধনা রেগুলার চান্দেলি থেকে উইক-এণ্ডে আসে?'

জয়া সংক্ষেপে বলল, 'হ্যাঁ।' সাধনা যে এখন বম্বেতেই তাদের ফ্ল্যাটে আছেন, সেই কথাটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলল না।

চন্দ্রা বলল, 'আই হ্যাভ নেভার সীন সাচ এ টাইপ ইন মাই হোল লাইফ।'

জয়া উত্তর দিল না।

চন্দ্রা আবার বলল, 'কী সুখ সে পায় এতে? তোর বাবাও বা কেমন! হাউ হী টলারেটস দ্যাট ওম্যান? ওদের রিলেসানটা যে কী আমি বুঝতে পারি না। ইটস এ মিস্ট্রি টু মী।'

কার্নাল সিং খুবই ভদ্র মানুষ, সত্যিকার স্পোর্টসম্যান। এসব ব্যাপার তিনি এড়িয়েই যেতে চান। তিনি বললেন, 'আঃ চন্দ্রা, জয়াকে এসব বলে কী হবে? আর ওর বাবার সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলার কী সম্পর্ক, তা নিয়ে তুমি কেন ভাবছ? তোমার কাছে তো ওটা ক্লোজড চ্যাপ্টার।' বলেই জয়ার দিকে ফিরলেন, 'তোমার মায়ের কথায় কিছু মনে কোরো না জয়া।'

জয়া অল্প হাসল, কিছু বলল না।

কার্নাল সিং আবার বললেন, 'আগে দরকারী ব্যাপারটা সেরে নিই তারপর গল্প করা যাবে।'

জয়া উন্মুখ হল।

কার্নাল সিং বললেন, 'নেক্সট মান্থের ফার্স্ট উইকে, ধরো চার তারিখের মধ্যে নিউ ইয়র্কের দুটো টিকিট চাই। জাম্বো প্লেনের সীট 'বুক' করবে।'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ এয়ার লাইনসে চাইছেন?'

'আই হ্যাভ নো চয়েস! ওটা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তুমি যে এয়ার লাইনসে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে আমরা তাতেই যাব।'

আচ্ছা—'

'কবে জানাবে?'

'কাল পরশুর মধ্যে।' জয়া ডায়েরিতে কার্নাল সিং আর চন্দ্রার নাম টুকে নিল। তারপর বলল, 'এবার ক'দিন বাইরে থাকছেন?'

কার্নাল সিং বললেন, 'লম্বা ট্যুর। কম করে মাস তিনেক থাকতে হবে। আমেরিকা থেকে কানাডা যাব। সেখান থেকে ইওরোপের দু একটা কানট্রি হয়ে আসব। যাক, কাজের কথা হয়ে গেল। এবার তোমার কথা বল।'

বেয়ারাকে দিয়ে কার্নাল সিংয়ের জন্য কফি আনিয়ে জয়া বলল, 'আমার আবার কী কথা! সকালবেলা উঠে ট্রেন ধরে অফিসে আসছি, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরছি। এইভাবে লাইফ কেটে যাচ্ছে।'

'নো নো, দিস ইজ নো গুড'। পোলো খেলোয়াড় কার্নাল সিং জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'তোমাকে আগেও বলেছি; এখনও বলছি, এভাবে একটা মেয়ের চলতে পারে না।'

জয়া উত্তর দিল না।

কার্নাল সিং বলতে লাগলেন, 'তোমার সম্বন্ধে চন্দ্রা আর আমি অনেক ভেবেছি। এক কাজ কর না—'

জয়া মুখ তুলল, 'কী?'

'আজ ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। কোথাও গিয়ে খানিকক্ষণ বসা যাক। অ্যাণ্ড লেট আস ডিসকাস দা ম্যাটার—'

'কাল ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিলাম। আজ ভীষণ কাজের চাপ রয়েছে। কিছুতেই পারব না।'

'একেবারেই ইমপসিবল?'

হ্যাঁ?'

একটু ভেবে কার্নাল সিং বললেন, 'তা হলে তোমাকে ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। ওনলি আই শ্যাল টেক টেন মিনিটস ফ্রম ইওর ভ্যালুয়েবল টাইম।'

জয়া অপেক্ষা করতে লাগল।

কার্নাল সিং বললেন, 'তোমার একটা বিয়ে হওয়া দরকার। ইউ শুড হ্যাভ এ লাইফ পার্টনার।' জয়ার সম্পর্কে তাঁর এক ধরনের স্নেহ আছে। স্নেহটা বেশ আন্তরিকই। হয়ত স্ত্রীর প্রথম পক্ষের মেয়ের সম্বন্ধে মনে মনে খানিকটা দায়িত্বও অনুভব করেন।

চন্দ্রাও বলল, হ্যাঁ, বয়স হয়ে যাচ্ছে। এবার একটা বিয়ে কর।'

জয়া চুপ করে রইল। এই কথাটা আগেও ওরা, বিশেষ করে কার্নাল সিং অনেক বার বলেছেন।

কার্নাল সিং আবার বললেন, 'একটা কথার উত্তর দাও তো?'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'প্রেম-ট্রেম করছ?

জয়া প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। ঠিক এই রকম একটা প্রশ্নের জন্য সে তৈরি ছিল না। একটু পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, অফিসের এত কাজ, তার মধ্যে ওসবের সময় কোথায়?' বেশ ক'বছর ধরেই অজয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সে কথা তো কার্নাল সিংকে বলা যায় না। জয়া ও ব্যাপারটা গোপনই রাখল।

স্পোর্টসম্যান কার্নাল সিং বেশ মজার মানুষ। তিনি বললেন, 'আই সী, যে চাকরি করে সে বুঝি প্রেম করে না! অবশ্য সিনসিয়ারলি করতে গেলে একটার বেশি কিছু করা যায় না। আফটার অল, প্রেম একটা হোল-টাইম জব।'

জয়া হেসে ফেলল।

কার্নাল সিং বললেন, 'তোমার মতো একটা হ্যাণ্ডসাম ইয়াং লেডি এখনও একটা প্রেম করে উঠতে পারল না! স্ট্রেঞ্জ! ইউ আর টোটালি আনফিট ফর দি ওয়ার্ল্ড।'

জয়া হাসতেই লাগল।

'স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে দেখো, বম্বে সিটিতে তোমার এজের যে কোন মেয়ে প্রেমের সেঞ্চুরি কমপ্লাট করে ফেলেছে। আর তুমি! না, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' বলতে বলতে একটু থামলেন কার্নাল সিং। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'এনিওয়ে, তোমার যখন ওদিকে কোন ইন্‌ভল্‌ভমেণ্ট নেই তখন ভালই হয়েছে। একটা খুব ভালো ম্যাচ তোমার জন্যে ঠিক করে রেখেছি। দি বয় ইজ ভেরি ব্রাইট, হিজ ফিউচার ইমেনসলি প্রসপেকটিভ।' চন্দার দিকে ফিরে বললেন, জয়াকে ছেলেটার সম্বন্ধে ডিটেলস বল তো—'

চন্দ্রা যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। যে ছেলেটির সঙ্গে জয়ার বিয়ের কথা তারা ভেবেছে সে মহারাষ্ট্র ক্যাডারের একজন আই-এ-এস। বত্রিশ তেত্রিশের মতো বয়স। অত্যন্ত হ্যাণ্ডসাম। চার্মিং পার্সোনালিটি। বাবা গুজরাটী, মা মারাঠী। বাবা বম্বের বিগ বিজনেসম্যান। ওই একমাত্র ছেলে তাঁদের। মহারাষ্ট্র গর্ভনমেণ্টের একটা কর্পোরেশনের সে চেয়ারম্যান। লাইফে রাইজ করার অনেক সুযোগ আছে তার। পাত্র হিসেবে এমন ছেলে খুবই লোভনীয়।

কার্নাল সিং বললেন, 'ছেলেটিকে আমাদের দারুণ পছন্দ। এখন তুমি রাজী থাকলেই হয়—'

বাইরে খুই সহজভাবে কথা বললেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল জয়া। সে বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে এখনও আমি কিছু ভাবি নি।'

'এক্ষুনি কিছু বলতে হবে না। ইউ টেক ইওর টাইম। কোন তাড়াহুড়ো নেই। আমরা আমেরিকা-টামেরিকা থেকে ঘুরে আসি; তুমি তার মধ্যে ডিসিসনটা নিয়ে নাও।'

'দেখি—'

'জয়া-ডিয়ার, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্য বয় রমেশ ইজ ব্রিলিয়াণ্ট। তুমি সুখী হবে।'

জয়া এবার উত্তর দিল না।

কার্নাল সিং বলতে লাগলেন, তুমি মনে কোরো না লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা কিছু করব। তোমার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নেব। বাট দ্যাট ইজ আফটার আওয়ার রিটার্ন ফ্রম আমেরিকা অ্যাণ্ড ইওরোপ।'

জয়া বলল, 'এখনও অনেক সময় আছে।'

'তা আছে। তবে যাবার আগে আমি একটা কাজ করে দিয়ে যেতে চাই।'

'কী কাজ?'

'রমেশের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।' বলে একটু ভেবে নিলেন কার্নাল সিং। তারপর আবার বললেন, 'আজ ছুটির পর কী করছ?

জয়া তাঁর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছিল। সে জানে কার্নাল সিং ভয়ানক ছটফটে ব্যাস্তবাগীশ মানুষ। তাঁর মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সেটা তক্ষুনি না করে ফেলা পর্যন্ত রেহাই নেই। ব্যাপারটা পোকার মতো তাঁকে যেন কামড়াতে থাকে। অজয়ের মুখ এই মুহূর্তে মনে পড়ছিল জয়ার। আজ অজয় নিশ্চয়ই তাকে ফোন করবে। না করলেও সে নিজেই অজয়ের সঙ্গে যেমন করে হোক দেখা করবে। জয়া বলল, 'ছুটির পর একটা কাজ আছে।'

'আর্জেন্ট?,

'খুব।'

'কাজটা আরেক দিন করলে হয় না?'

'না।,

'ঠিক আছে, কাল অফিস আওয়ার্সের মধ্যে কোন এক সময় তোমাকে ফোন করব। কাল কিন্তু কোন রকম অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখবে না।,

'তা না হয় না রাখলাম। কিন্তু কেন বলুন তো—'

'রমেশের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। নিজের এণ্টার-প্রাইজে একটা প্রেমও তো করে উঠতে পারলে না। এ ব্যাপারে আমিই তোমাকে হেল্প করব। আর—'

'আর কী?'

'চন্দ্রা ছু-ছুটো বিয়ে করেছে। তার কাছ থেকে প্রেমের টেকনিক্যাল নো-হাউটা জেনে নিও।'

চন্দ্রা চোখ কুঁচকে বলল, 'আঃ, কী হচ্ছে! আফটার অল জয়া ইজ মাই ডটার।'

কার্নাল সিং শব্দ করে হাসলেন, 'ডটারের সামনে যা একখানা আইডিয়াল এগজাম্পল সেট করেছ! যাই হোক—' বলেই জয়ার

দিকে তাকালেন, 'তা হলে ওই কথা রইল। রমেশের সঙ্গে কাল তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আশা করি তোমারা দু'জনে তিন সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নাইনটি পারসেণ্ট কাজ এগিয়ে রাখবে। বাকী টেন পারসেণ্ট আমরা ফিরে এলে চুকিয়ে ফেলব। ও-কে ?'

জয়া বলল, 'অত তাড়াহুড়োর কী আছে ? আপনারা ফিরে আসুন ; তারপর দেখা যাবে।'

'ও নো মাই ডিয়ার, অনেক আগেই তোমার ওপর আমাদের জোর করা উচিত ছিল। সেটা যখন করা হয় নি তখন আর ব্যাপারটা ফেলে রাখব না। কালই ও ব্যাপারটায় জিরো আওয়ার ডিক্লেয়ার করে গেলাম।'

জয়া বুঝতে পারছিল, আপত্তি করে কাজ হবে না। সে যত না-না করবে, কার্নাল সিং-এর গোঁ ততই বেড়ে যাবে। জয়া ঠিক করে ফেলল, কার্নাল সিং যখন ফোন করবেন তখন কিছু একটা বানিয়ে বলে এড়িয়ে যাবে। সে বলল, 'কালকের ব্যাপার কাল দেখা যাবে।'

'তা হলে আজ ওঠা যাক।'

কার্নাল সিংরা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর জয়া দেখতে পেল, নিচে ফিরোজ শা মেটা রোডে সেই ইমপোর্টেড আমেরিকান কারে ওঁরা উঠে পড়লেন। তারপর হাজার হাজার গাড়ির স্রোতে ওঁদের গাড়িটা একটা ফোঁটার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

নয়

আবার ফাইলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল জয়া। অবশ্য তার ফাঁকে ফাঁকে নানা এয়ার লাইনস অফিসে ফোন করে করে জেনুইন পাসপোর্ট হোল্ডার ক্লায়েণ্টদের জন্য প্লেনের সীট 'বুক' করেছে।

ছুটোর সময় বেয়ারা এসে টিফিনের প্যাকেট আর চা দিয়ে গেল। অফিস থেকে বিনা পয়সায় তাদের টিফিন দেওয়া হয়। চা বা কফি

যখন এবং যত বার ইচ্ছে চাইলেই পাওয়া যায়। তার জন্য পয়সা দিতে হয় না।

খাওয়া শেষ করে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে জয়া, টেলিফোন বেজে উঠল। ক্রেডেল থেকে রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই অজয়ের গলা শোনা গেল. 'সর্বনাশ হয়ে গেছে জয়া ; আই অ্যাম ফিনিশড।'

জয়া চমকে উটল, 'কী ব্যাপার ?'

'মাদ্রাজ থেকে দাদা বৌদি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে দশ মিনিট আগে বাড়িতে এসেছে। এসেই আমাকে ফোন করেছে।'

'হঠাৎ ওঁরা চলে এলেন !'

'তোমার মেমোরিতে রাস্ট পড়ে যাচ্ছে দেখছি। মনে নেই, এবার আমরা ফাইনাল বিয়েটা করছি বলে ওদের টেলিগ্রাম করেছিলাম ?'

শুকনো কাঁপা গলায় জয়া বলল, 'ও—'

অজয় বলল, 'দাদাকে তো জানো, সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমেই এক কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে।'

'কী ?, ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল জয়া।

'কোন খবর না নিয়েই এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে নটরাজ হোটেলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে একটা পার্টির ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ওয়েস্টার্ন কমাণ্ডে ওর যে সব বন্ধু-টন্ধু আছে তাদের সবাইকে পার্টিতে ইনভাইট করে তবে কোলাবায় এসেছে। বিয়ে হয় নি অথচ বৌ-ভাতের ফাংশান অ্যারেঞ্জড হয়ে গেল! আই অ্যাম রিয়ালি কনফিউজড। বুঝতে পারছি না, এখন কী করব! ইমিডিয়েটলি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

জয়া ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সে বলল, 'এখন আমি কী করে বেরুব !'

'বেরুতেই হবে।,

'ডোণ্ট বী ইমপেসেণ্ট ; এখন বেরুতে গেলে অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধা থাকলেও বেরুতে হবে। এটা লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের ব্যাপার। আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি স্টারলিং সিনেমার কাছে চলে এসো। আই শ্যাল পিক আপ ইউ।' বলেই লাইনটা কেটে দিল অজয়।

অগত্যা খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই জেনারেল ম্যানেজার ডি সুজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করল জয়া। ডি-সুজা কড়া টাস্ক মাস্টার কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুবই সহৃদয়। জয়া এমনিতে ছুটিছাটা নেয় না; কাজের ব্যাপারে ভয়ানক সীরিয়াস। যদিও কাল ক্যাজুয়াল লীভ নিয়েছিল, আজও বলামাত্র ছুটি পেয়ে গেল।

স্টারলিং সিনেমার সামনে পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে হল না। অজয় তার অফিসের গাড়িতে এসে জয়াকে তুলে নিল। ড্রাইভারকে বলল, 'কোলাবা—'

জয়া চমকে উটল, 'বাড়ি যাচ্ছ নাকি?'

অজয় বলল, 'আমার মাথার ভেতর জট পাকিয়ে যাচ্ছে। দাদাকে কি করে ফেস করব বুঝতে পারছি না। থার্ড টাইমেও বিয়ে করতে পারি নি শুনলে ও যা-তা একটা কাণ্ড করে বসবে। তুমি সঙ্গে থাকলে একটা মরাল সাপোর্ট অন্তত পাবো।'

হটাৎ ঢোঁক গিলতে কষ্ট হল জয়ার। মুখের ভেতরটা তেতো লাগল যেন বলল, 'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু না। বিয়েটা না হওয়ার ব্যাপারে তোমার ক্রেডিট ওয়ান হানড্রেড পারসেণ্ট। দাদাকে ফেস তো তোমারই করা উচিত।,

জয়া দম বন্ধ করে বসে থাকল।

অজয় একটু ভেবে বলল, 'মা যদি এর মধ্যে সব বলে-টলে ম্যানেজ করে থাকে, আমরা বেঁচে যাব। নইলে বোথ অফ আস শ্যাল হ্যাভ টু ফেস দা মিউজিক।'

একটু চুপ। তারপর জয়ার দিকে খানিকটা ঝুঁকে গভীর গলায় অজয় বলল, 'একটা কথা বলল?'

জয়া তার দিকে তাকাল। অজয় বলতে লাগল, 'জোর করে কখনও

তোমার কাছে জানতে চাই নি। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এখন আর না জানলেই নয়। মায়ের কাছে, দাদা-বৌদিদের কাছে বার বার বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হচ্ছে। অথচ আমি জানি না, কেন আমাদের বিয়েটা হচ্ছে না? আমাদের অসুবিধাটাই বা কোথায়?' থেমে আবার বলল, 'আশা করি তুমি ভুল বুঝবে না। আমার ফীলিংস বুঝতে চেষ্টা করবে।'

জয়া তক্ষুনি উত্তর দিল না। সে জানে অজয় ছটপটে আমুদে ধরনের ছেলে হলেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ সীরিয়াস; বিশেষ করে জয়ার সম্পর্কে। তার আন্তরিকতার মধ্যে কোন রকম জোলো ব্যাপার নেই। জয়া যেভাবে তিন তিন বার বিয়ের ফর্মে সই না দিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে চলে এসেছে, তাতে অন্য পুরুষ হলে কবেই সম্পর্কটা কেটে যেত। সে বুঝতে পারছিল বিয়ের সম্বন্ধে তার দ্বিধাটা আর গোপন রাখবে না। দিনে দিনে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। অজয়ের কাছে খোলাখুলি বললে সে হয়ত রাস্তাও বার করে ফেলতে পারে।

কিছুক্ষণ পর জয়া বলল, 'আজ তোমাকে সব বলব।'

গাড়িটা এক সময় কোলাবায় বিরাট এক হাই-রাইজ বিল্ডিংএর সামনে এসে দাঁড়াল।

দশ

অফিসারদের জন্য অজয়দের এয়ার লাইনস কোলাবার এই বাড়িটার ফিফটীনথ আর সিক্সটিনথ ফ্লোরের সব ক'টা স্যুইট কিনে নিয়েছে। অজয়ের ভাগে পড়েছে ফিফটীনথ ফ্লোরের দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটটা।

আগেও এখানে অনেক বার এসেছে জয়া। কিন্তু লিফট থেকে বেরিয়ে লম্বা প্যাসেজ ধরে অজয়ের ফ্ল্যাটের সামনে আসতে আসতে আজ গলগল করে ঘেমে যেতে লাগল সে। ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল জয়া।

অজয় ততক্ষণে কলিং বেল বাজিয়ে দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে বিজয় বেরিয়ে এল। হুবহু অজয়ের মতোই দেখতে; তবে হাইট আরেকটু বেশি। বয়সে বড় হওয়ার জন্য চেহারাটা ভারিক্কী। এক্সট্রা তার যা আছে তা হলো ছাঁটা গোঁফ। অজয়েব গোঁফ নেই।

দরজাব ফ্রেমের ভেতর দাঁড়িয়ে বিজয় ভাইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবাব দেখে নিল। ঠোঁট কুঁচকে বলল, 'ওয়ার্থলেশ।' তারপর জয়ার দিকে ফিরে বলল, 'বোথ অফ ইউ।'

আগেই বিজয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে জয়ার। সে কিছু বলল না; মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

অজয় মুখটা করুণ করে অল্প একটু হাসল। তারপর বলল, 'তুমি তা হলে সব শুনেছ!'

'তাই তো মনে হয়। কাম ইন।' অজয় আর জয়াকে সঙ্গে করে ড্রয়িং রুমে চলে এল বিজয়। বলল, 'সিট ডাউন—. তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল নিষ্ঠুর জেনারেলের মতো সে কোর্ট মার্শালের অর্ডার দেবে।

অজয় আর জয়া চুপচাপ দুটো সোফায় বসে পড়ল। বিজয়ও তাদের মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, 'মা আমাকে সব বলেছে। কিন্তু তার আগেই আমি তোদের ওয়েডিং রিসেপসানের জন্যে হোটেল 'বুক' কবেছি, বন্ধুদের ইনভাইট করেছি। আমার প্রেসটিজটা গেল।'

অজয় মিনমিনে গলায় বলল, 'ইনভাইট করার আগে সব ব্যাপারটা জেনে নিলে না কেন? তুমি তো জানোই, আগেও দু বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে আমরা ফিবে এসেছি।'

বিজয় গলার স্বর অস্বাভাবিক ভারী করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'থার্ড টাইমেও যে দু জনে মিলে একটা বিয়ে করে উঠতে পারবি না, এটা আমি ইমাজিন করতে পারি নি।' একটু থেমে অজয় এবং জয়া দু জনকেই বলল, 'বল, বল—কবে থেকে প্রেম করছিস তোরা? ইউ ইয়ং

লেডি, স্পীক আউট।' বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলদের মতো জেরা শুরু করে দিল বিজয়।

বিজয়ের ধরণটাই এই রকম। জয়া তার দিকে তাকাতে পারছিল না। শরীরের সব রক্ত লাফ দিয়ে তার মুখে উঠে এসেছিল। সে কিছু বলল না, ঘাড় ভেঙে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকল।

অজয় বলল, 'তিন চার বছরের মতো—'

'তিন চার বছরে বাইশটা গ্রেট ওয়ারের ডিসিসান নেওয়া যায়।'

বিজয়ের চেঁচামেচিতে ভেতর থেকে মোহিনী, বিজয়ের দুই ছেলে রাম আর অর্জুন এবং অজয় বিজয়ের মা লীলাবতী এ ঘরে চলে এলেন।

অজয়ের মা বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওদের অত বকাবকি করছিস কেন?'

বিজয় গলার স্বর তিন পর্দা চড়িয়ে বলল, 'বকাবকি! ওদের ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে কোর্ট মার্শাল করা উচিত। আচ্ছা মা '

লীলাবতী এর মধ্যে বিজয়ের পাশে বসে পড়েছিলেন। মোহিনী জয়ার গা ঘেঁষে তারই সোফায় খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। রাম আর অর্জুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মুখের ওপর দিয়ে মুভি ক্যামেরার মতো তাদের চোখ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল।

লীলাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছিস?'

বিজয় বলল, 'তেমার নিশ্চই মনে আছে, তখন মাদ্রাজে আমার কাছে ছিলে, একদিন সন্ধ্যেবেলা তোমাকে নিয়ে মোহিনীর কথক ড্যান্স দেখতে গিয়েছিলাম। ড্যান্স রাবিশ, তবে মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়। নাচের পর তোমার পারমিসান নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে একটা ফুলের 'বোকে' কিনে ওকে কনগ্র্যাচুলেট করলাম—'

বিজয় তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সমানে বলতে লাগল, 'সেই ড্যান্সের পর আমাদের বিয়ে করতে ক'দিন লেগেছিল?'

জয়া জানে, লীলাবতীর সঙ্গে অজয় বিজয়ের সম্পর্ক পুরোপুরি

বন্ধুর মতো। লীলাবতী বললেন, 'ক'দিন আর, মাস দুয়েকের মতো।'

'আর এই গাধাটা আমার ভাই হয়ে তিন চার বছর ধরে ঝুলেই আছে। কোন ব্যাপারে ওর প্রম্পটনেস নেই।'

'সবাই তো তোর মতো মিলিটারি না। যা মাথায় এল দু মিনিটের ভেতর করে ফেললি!' লীলাবতী হাসতে লাগলেন।

বিজয় সেন্টার টেবলে দুম করে একটা ঘুষি মেরে বলল, 'করতে হবে। কোন কিছুই বেশি দিন ঝুলিয়ে রাখতে নেই। ওয়ারের সময় দশ মিনিট দেরি হয়ে গেলে একটা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।'

লীলাবতী বললেন, 'এটা ওয়ার না, এটা হলো বিয়ে।'

'বিয়ে আর ওয়ার একই ব্যাপার। একবার হাতছাড়া হলে খুবই মুসকিল।'

এদিকে জয়ার কানের কাছে মুখ এনে মোহিনী খুব নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে বলছিল, 'চার বছর ধরে প্রেম করছ! বিয়ে না করে আছ কি করে?'

জয়া আড়ষ্ট গলায় বলল, 'না, মানে—'

'এ্যাই, একটা কথা বলবে?'

'কী?'

'অজয় তোমাকে চুমু খেয়েছে?'

জয়া চোখের কোণ দিয়ে মোহিনীকে দেখতে দেখতে বলল, 'ধুৎ—'

মোহিনী বলল, 'হাত বুলোয় নি?'

'কিসে হাত বুলোবে?'

'শরীরের সেই সব জায়গায় যেখানে হাত দিলে ইলেকট্রিক শক লাগে। বলে দেয় নি?'

আগেও যখন দু চারবার দেখা হয়েছে মোহিনী এসব কথা জিজ্ঞেস করেছে। দক্ষিণী এই নাচিয়ে মেয়েটার মুখ ভীষণ আলগা।

জয়ার কানের লতি ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সে বলল, 'তুমি অসভ্য মোহিনীদি।'

জয়ার কানের ডগায় পিঁপড়ের মতো কুট করে একটা কামড় বসিয়ে মোহিনী গলার স্বরটা আরো নামিয়ে দিল। বাতাসের মতো শব্দ করে বলল, 'অজয় আর কিছু করে নি?'

মোহিনীর ইঙ্গিতটা জয়া বুঝতে পারছিল। এমনিতে সে খুবই স্মার্ট কিন্তু সেক্স নিয়ে কথাবার্তা বলতে তার ভালো লাগে না। বিশেষ করে সেটা যদি নিজের সম্পর্কে হয়। সে চুপ করে রইল।

মোহিনী আবার বলল, 'বিয়ের আগেই বাবা আমাদের কিন্তু সমস্ত কিছু হয়ে গিয়েছিল। দুজনে দুজনের সব জেনে শুনে বুঝে তবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গেছি।'

জয়ার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বরফ নেমে গেল। সে বলল, 'যদি কোন কারণে বিয়েটা না হতো?'

'হতোই। সেটা বুঝেই তো আমরা এগিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুই করতে পারো নি। একেবারে আনটাচড, আনকিসড, আনস্মেলট হয়েই আছে। সেই ইণ্ডিয়ান মাইথোলজিতে মুনিঋষিদের অশ্রমে পবিত্র পবিত্র ভার্জিন গার্লরা ঘুরে বেড়াত তুমি বাবা অবিকল তাই।' দারুণ কথা বলতে পারে মোহিনী। একটু থেমে পরক্ষণেই আবার সে শুরু করে দিল, 'এত বয়স হয়ে গেল। টগবগে পুরুশের মতো একটা পুরুষ জড়িয়ে ধরে না শুলে ঘুমোও কি করে?'

জয়ার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সে বলল, 'কী হচ্ছে মোহিনীদি!'

দক্ষিণী মেয়েটা চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে হাসতে লাগল, 'তিন বারের অ্যাটেম্পটে বিয়েটা তো করতে পারলে না তোমরা। ভাবছি যাবার আগে অজয়কে একটা টপ সিক্রেট শিখিয়ে দিয়ে যাব। তিন দিনের মধ্যে যদি তখন বিয়েটা না হয় কুচ করে নিজের কানদুটো কেটে ফেলব।'

জয়ার কৌতূহল হচ্ছিল। তবে ভয়টাই বেশি। সে বলল, 'কী শেখাবে অজয়কে ?'

'ওটা পুরুষদের প্রেসক্রিপসন।'

'তুমি জানলে কি করে ?'

'বিয়ের পর মেয়েরাও জানতে পারে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জানবার জন্য রেস্টলেস হয়ে উঠেছ। ঠিক আছে, জেনেই নাও। অজয়কে বলে যাব, একদিন তোমাকে কোন একটা ঘরের ভেতর নিয়ে ছিটকিনি আটকে যা ইচ্ছা যেন করে। তারপরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

জয়া চমকে উঠল, 'মোহিনীদি। প্লীজ, এ সব অজয়কে শেখাবে না।'

মোহিনী আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওধার থেকে বিজয় ডেকে উঠল, 'জয়া—' জয়া তার দিকে ফিরতেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বিয়েটা হচ্ছে না কেন ? শুনছি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে সই করার সময় প্রত্যেকবার তুমি কেঁদে ফেলছ। মিস্ট্রীটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি ব্যাপারটা আমাকে পরিষ্কার করে বলবে ?'

জয়া চুপ করে রইল। সে জানত বিজয় এ সব প্রশ্ন তাকে করবে।

লীলাবতী বিজয়কে বললেন, 'উকিল ব্যারিস্টারের মতো মেয়েটাকে তোর জেরা করতে হবে না। নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা আছে। যখন ওর মনে হবে তখন ঠিকই বলবে।'

জয়া জানে লীলাবতী তাকে খুবই স্নেহ করেন। এর আগে দু দু বার যখন বিয়ের কাগজপত্র সে সই দিতে পারে নি, তখনও লীলাবতীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কেন বিয়েটা হল না, এ নিয়ে তিনি কখনও কোন প্রশ্ন করেন নি বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। মানুষের মনে কখন কোথায় জট আটকায় কেউ বলতে পারে না। সময়ই নিজের হাতে সেই জট খুলে দেয়। তার জন্য ধৈর্য দরকার। অজয়কে

তিনি তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছেন। জয়ার ব্যাপারে সহানুভূতি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

বিজয় বলল, 'আরে বাবা, জেরা করব কেন? জয়া যদি ওর অসুবিধার কথা বলে আমরা সে ব্যাপারে ওকে সাহায্যও তো করতে পারি। তা ছাড়া বার বার বিয়েটা হয়ে হয়েও হচ্ছে না। আমাদের সবার ওপরেই একটা বাজে রি-অ্যাকসান হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। জয়া বড় হয়েছে; লেখাপড়া জানা মেয়ে। এসব ও নিশ্চয়ই বোঝে; মনে মনে কষ্টও পাচ্ছে। এ নিয়ে ওকে আর কিছু বলার দরকার নেই।'

বিজয় বলল, 'তোমার কথাই থাক, কিন্তু আমার চামড়া এখন কেমন করে বাঁচাই। সন্ধ্যেবেলা নটরাজ হোটেলে পার্টি'র কী হবে?'

অজয় বলল, 'পার্টি'টা ক্যানসেল করে দাও।'

'নো, কিছুতেই না। ওয়েডিং রিসেপসানের ব্যবস্থা যখন করেই ফেলেছি তখন ওটা হয়েই যাক। ওটা তো করতেই হতো। একটা স্টেপ এগিয়ে থাকি। বিয়েটা পরে হবে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ভয়ে ভয়ে জয়া জিজ্ঞেস করল, 'পার্টি'তে কি আমাকে থাকতে হবে?'

বিজয় খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোমার জন্যেই পার্টি' আর তুমিই থাকবে না! রিয়ালি স্ট্রেঞ্জ!'

কিন্তু—'

'কী?'

কালও বাবাকে বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির কথা বলে রাত করে ফিরেছে জয়া। আজ রাত করে ফিরলে কী বলবে বাবা? রোজ রোজ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে গেলে নিশ্চয়ই সে ধরা পড়ে যাবে। তা ছাড়া আজ্ আবার সাধনা মাসী রয়েছেন বাড়িতে। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। জয়া ঢোঁক গিলে বলল, পার্টি শেষ হতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'কত আর রাত হবে ! সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে ফিনিশ করে ফেলব। একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। কাল মর্নিং ফ্লাইট ধরে মাদ্রাজ ফিরতেই হবে। পার্টিতে বেশি রাত করলে সকালে উঠতে পারব না।'

বাবার মুখটা সামনের সব কিছু ঢেকে দিয়ে ফুটে উঠছিল। জয়া বলল, 'কিন্তু বাবাকে আমি কিছু বলে আসি নি।'

'বম্বেতে ন'টা দশটা আবার রাত নাকি! এর জন্যে আবার বাবাকে বলে আসতে হয়! ইউ আর সাফিসিয়েণ্টলি গ্রোন আপ।'

'না, আমি রাত করে বাইরে থাকি না তো। বাবা ভাববেন।'

'এক কাজ করো না ; বাড়িতে ফোন করে বলে দাও ফিরতে দেরি হবে। আচ্ছা তোমাকে করতে হবে না। নাম্বারটা দাও, আমিই তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।'

জয়া আঁতকে ওঠার মতো বলল, 'না না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু—'

'আবার কী ?'

'পার্টির ব্যাপারটা আমি জানতাম না। এমনি একটা শাড়ি পরে চলে এসেছি। এই পোশাকে ঠিক —'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বিজয়, 'ওটা আবার একটা প্রবলেম ! একদিনের জন্যে মোহিনী মাদ্রাজ থেকে বম্বে এসেছে ; সঙ্গে করে বোধহয় একটা কটন মিলের সারা বছরের আউট-পুটই নিয়ে এসেছে। ওর কাছ থেকে যা-যা দরকার নিয়ে নিও।'

নাঃ, কোন ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। ঘরের কোণে টেলিফোনের স্টাণ্ড। সেখানে গিয়ে ডায়াল করতে লাগল। একটু পর ওধার থেকে শিবনাথের গলা ভেসে এল। প্রথমটা নার্ভাস বোধ করল জয়া। তারপর বলল, 'একটা খুব মুশকিলে পড়ে গেছি বাবা—'

'কী ?'

'কাল যে বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে গিয়েছিলাম' তারা আজ ধরেছে ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখে যাবার জন্যে। টিকিটও কেটে ফেলেছে। অ্যাভয়েড করতে পারছি না।'

'সিনেমা দেখেই আসিস। কখন ফিরবি?'

'দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যাবে। সিনেমা দেখার পর ওরা খাওয়ার কথা বলছে।'

'অ্যাভয়েড না করতে পারলে খেয়েই আসিস।'

'তুমি আর সাধনা মাসী আমার জন্যে ওয়েট কোরো না। খেয়ে নিও।'

'সাধনা নেই ; চান্দেলিতে চলে গেছে।'

জয়া অবাক হল, 'হটাৎ চলে গেল! এ সপ্তাহটা থাকবে বলেছিল!'

শিবনাথ বললেন, 'তুই চলে যাবার পর অফিস থেকে ফোন এসেছিল। কী একটা গোলমাল হয়েছে, তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলল সাধনাকে। এই উইকে ও আর আসছে না।'

সাধনার অফিসে জয়াদের ফ্ল্যাটের ফোন নাম্বার আছে। ইমার্জেন্সি হলে অফিস থেকে তাঁকে ঐ নাম্বার ধরা হয়। জয়া বলল, 'ও, আচ্ছা। তারা ফিরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তারাকে বলবে, ঠিকমত খাবার-টাবার যেন গরম করে দেয়, মনে করে ওষুধ খাবে।'

'ঠিক আছে।' বলে শিবনাথ থামলেন একটু, পরে বললেন, "তুই কোত্থেকে ফোন করছিস?'

জয়া হকচকিয়ে গেল। এরকম প্রশ্নের জন্য খুব সম্ভব সে তৈরি ছিল না। জড়ানো গলায় বলল, 'এই, মানে অফিস থেকে—'

'কিছুক্ষণ আগে সাধনার কথা বলার জন্যে তোর অফিসে ফোন করেছিলাম। ওরা বললে, তুই নাকি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেছিস!'

গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল জয়ার। সে বলল, 'ছুটি নিই

নি তো। এমনি একটু বেরিয়ে ছিলাম।'

'তা হলে কি আমি ছুটির কথাটা ভুল শুনলাম?'

জয়া উত্তর দিল না। তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। জয়ার ভয় হল, বাবা যদি কোন কারণে আবার অফিসে ফোন করে বসেন। শ্বাসরুদ্ধের মতো সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ছুটির কথাটা বলেছিলাম। তাই হয়ত তোমাকে জানিয়েছে। আমি কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি।'

'আচ্ছা, তোর বন্ধুটির নাম কি রে?'

'কার কথা বলছ?'

'ঐ যে যার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি গেল।'

শিবনাথ কি কিছু সন্দেহ করেছেন। জয়ার মুখে যে নামটা এল তাই বলে ফেলল, 'শিরিন—'

শিবনাথ বললেন, 'কাল কি শিরিনের কথাই বলেছিলি?'

কাল কার নাম বলেছিল, জয়া মনে করতে পারল না। তার নাকমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। সে বলল, 'আর কোন নাম বলব!'

'তা-ই হবে হয়ত। আচ্ছা তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করিস।'

লাইনটা কেটে গেল।

এগার

অজয়রা কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় নটরাজ হোটেলে চলে এল। লীলাবতী অবশ্য আসেন নি।

মোহিনী তার হীরের সেট, মাইশোর সিল্ক আর দামী দামী কসমেটিকস দিয়ে জয়াকে রানীর মতো সজিয়ে দিয়েছিল এবং নিজেও প্রচুর সেজেছিল।

ওরা যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে নিমন্ত্রিতেরা একে একে এসে গেল।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় লীলাবতী বিজয়কে বলেছিলেন, সে যেন পার্টিতে মদটা কম খায় আর এমন কিছু না করে বা বলে যাতে

জয়া কষ্ট পায়। বিজয় প্রথমেই জয়ার সঙ্গে আর্মির বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছে, আমার ভাবী ভ্রাতৃবধূ। এরই অনারে এই পার্টি।

বিজয়ের এক বন্ধু কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তবে যে তখন বললে এটা ওয়েডিং রিসেপসান –'

'আরে বাবা, বিয়েটা তো হবেই। নেমন্তন্নটা না হয় অ্যাডভান্স খেলে।'

অন্য এক বন্ধু বলল, 'মজাটা কিন্তু পুরোপুরি হচ্ছে না, মেজর। পার্টি, রিসেপসান—এ সব বিয়ের পরই হয়।'

বিজয় বলল, 'বুঝেছি। ওদের বিয়ের পর আবার একটা পার্টি চাইছ। ও-কে, ডান। তাড়াহুড়োয় এবার আমাদের আত্মী-স্বজন, অজয়ের বন্ধু-টন্ধু, কাউকেউ বলা হয় নি। পরের পার্টিতে তাদের সঙ্গে তোমাাদরও ডাকব '

সবাই খুশিতে হুল্লোড় বাধিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিজয়ের আর্মির বন্ধুরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে করে এনেছিল। আর্মিতে যেমন হয়—ইণ্ডিয়ার সব প্রভিন্স থেকে বেছে বেছে লোক নেওয়া হয়। ফলে তাদের স্ত্রীরা কেউ পাঞ্জাবী, গুজরাটি, কেউ কুর্গী, কেউ মারাঠী, কেউ বা বাঙালী ইত্যাদি। ভারতের সব রাজ্যের দারুণ সুন্দরী সব মহিলা প্রজাপতির ঝাঁকের মতো জয়াকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের সবার হাতে একটা করে উপহারের প্যাকেট। প্যাকেটগুলো একের পর এক জয়াকে দিতে দিতে তারা মজার কথা বলছিল, হাসছিল এবং নানারকম অশ্লীল 'জোক' করে যাচ্ছিল।

একটা ব্যাপার জয়া লক্ষ করেছে, আর্মির লোকের বউরা দারুণ রগরগে নোংরা গল্প করতে ওস্তাদ; তাদের জিভে কিছুই আটকায় না; ওদের পর্নোগ্রাফির স্টকও অফুরন্ত। অজয় আর তাকে নিয়ে ওরা যা সব বলছে শুনতে শুনতে নাকমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল জয়ার।

এর মধ্যে ঝকঝকে উর্দি-পরা হোটেল বয়রা ট্রে-তে হুইস্কি আর সফট ড্রিংক সাজিয়ে গোটা ব্যাঙ্কুয়েট হলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর্মি অফিসারদের সফট ড্রিংক ছোঁবার প্রশ্নই ওঠে না। জয়া দেখল তাদের স্ত্রীরা দু-একজন বাদে ট্রে থেকে হুইস্কিই তুলে নিচ্ছে।

হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার, জোক, হঠাৎ হঠাৎ মেয়েদের গলায় ফিনকি দিয়ে ওঠা হাসি, ইত্যাদির মধ্যে ড্রিংক সেসান এবং ডিনার শেষ হল।

ঘড়িতে এখন ন'টা পঁচিশ। কোন পার্টি'ই এত আগে আগে শেষ হয় না। বিজয়ই তাড়া দিয়ে শেষ করিয়েছে। কাল সকালে তাকে মাদ্রাজের প্লেন ধরতে হবে।

একে একে গেস্টরা জয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেল। ফাঁকা ব্যাঙ্কুয়েট হলে এখন অজয়, বিজয়, জয়া আর মোহিনী। এক ধারে উপহারের প্যাকেটগুলো ড'াই হয়ে পড়ে আছে।

রাত যত বাড়ছিল জয়া ততই অস্থির হয়ে উঠেছিল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। সে বলল, 'আমাকে এবার ফিরতে হবে। বাবাকে বলেছি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি যাবো। এখনও যদি বেরুই এগারোটার আগে ফিরতে পারব না। বাবা খুব ভাববেন।'

অজয় বলল, 'ভয় নেই ; সাড়ে দশটার ভেতরেই বাবার মেয়ে বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, তোমাকে জুহুতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

অজয়ের কথার মধ্যে রগড়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু খোঁচা ছিল। জয়া জানে সেটা তার পাওনা। কিন্তু অজয় তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইছে ; এতে খুবই ভয় পেয়ে গেল সে। বলল, 'তুমি আবার কষ্ট করে এই রাত্তিরে অতদূর যাবে কেন ? আমি নিজেই চলে যেতে পারব।'

'তা পারবে। তবু আমি সঙ্গে যাবো ; দরকার আছে।'

মোহিনী পাশ থেকে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'দেখো, যেতে যেতে জয়াকে একেবারে খেয়ে ফেলো না। বাড়ি ফিরলে বাবা যেন চিনতে পারে সেটুকু অন্ততঃ রেখো।'

অজয় হাসতে লাগল। আর জয়ার ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল যেন। মুখ তুলে সে কারো দিকে তাকাতে পারছিল না।

অজয় অফিস থেকে তুটো গাড়ি নিয়ে এসেছিল। বিজয় বয়দের ডেকে উপহারের প্যাকেটগুলো গাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর বিল মিটিয়ে, বয়দের টিপস দিয়ে সবাই নিচে নেমে এল।

হোটেলের পার্কিং জোনে অজয়দের গাড়ি তুটো দাঁড়িয়ে ছিল। এত উপহার জয়া পেয়েছে যে একটা গাড়িতে ধরে নি। তুটো গাড়িরই ক্যারিয়ার বোঝাই হয়ে যাবার পর ফ্রন্ট এবং ব্যাক সীটের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রাখতে হয়েছে।

ঠিক হলো একটা গাড়িতে করে বিজয় আর মোহিনী কোলাবায় ফিরে যাবে। আরেকটা গাড়ি নিয়ে অজয় জয়াকে জুহুতে পৌঁছে দেবে।

বিজয় এবং মোহিনী সস্নেহে এবং আদরের ভঙ্গিতে জয়াকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমরা তা হলে যাই। এবার আর আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। মাদ্রাজ যাবার তু সপ্তাহের মধ্যে যেন ট্রাঙ্ক কল বা টেলিগ্রাম পাই যে তোমাদের রিয়েল বিয়েটা হয়ে গেছে। আর ব্যাপারটাকে ড্র্যাগ কোরো না। কথাটা মনে রেখো।'

জয়া ওদের প্রণাম করে বলল, 'রাখবো।'

বিজয়রা গাড়িতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বলল, 'আরে, এই গাড়িতেও প্রেজেন্টেশানের অনেক প্যাকেট রয়েছে। এগুলো তো জয়ার।' অন্য গাড়টার দিকে দ্রুত এক পলক তাকিয়ে বলল, 'ওটাও তো গো-ডাউনের মতো ভর্তি হয়ে আছে। কী করা যায় বল তো—' এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, আমরাও না হয় জুহুটা ঘুরে আসি। প্রেজেন্টেশানগুলো জয়াদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেওয়া যাবে।'

জয়া চমকে উঠল' 'না-না, ওগুলো আমি নিতে পারব না।'

'ওসব তো তোমার জিনিস।'

জয়া জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। কিছুতেই সে নেবে না।

মোহিনী কিছু একটা ভেবে নিয়েছিল। পাশ থেকে সে বলল, 'জয়ার অসুবিধাটা জেনুইন। ওর বাবা কিছু জানেন না। হটাৎ প্রেজেন্টেশানের একশোটা বাক্স নিয়ে হাজির হলে পজিশনটা ভীষণ অকোয়ার্ড হয়ে পড়বে।'

বিজয় ব্যাপারটা বুঝল। বলল, 'দ্যাটস রাইট। ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশানগুলো আপাতত অজয়ের ফ্ল্যাটেই নিয়ে যাই। তারপর তো জয়া একদিন না একদিন ওখানে পার্মানেন্টলি চলে আসছে।'

বিজয়রা একটা গাড়িতে উটে পড়ল। অন্য গাড়িটার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আচমকা জয়ার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অজয়দের ফ্ল্যাটে নিজের অফিসের পোশাক ফেলে মোহিনীর শাড়ি-জামা জড়োয়া-সেট পরে পার্টিতে এসেছিল। মোহিনীর শাড়ি-টাড়ি তাকে ফেরত দেওয়া উচিত। সে কথা বলতেই মোহিনী ভয়ানক আপত্তি জানালো, বিয়েটা না হোক, তবু আজ সোসাল একটা এ্যকসেপটান্স জয়া পেয়েছে। তার জীবনে আজকের দিনটা ডে অফ অল ডে'জ আজ এই রানীর সাজ ছাড়িয়ে কিছুতেই মোহিনী তাকে সাধারণ একটা প্রিন্টেড শাড়ি পরিয়ে বাড়িতে পাঠাতে পারবে না।

মাঝরাতে রানীর সাজে বাড়ি ফিরলে বাবা কী বলবেন বা ভাববেন, সেটা চিন্তা করতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়ল জয়া। মোহিনীর যে রকম আপত্তি তাতে এ ব্যাপারে আর কিছু বলে অবশ্য লাভ নেই। তবে দামী গয়নাগুলো দেখিয়ে জয়া বলল, 'এগুলো নিয়ে যাও মোহিনীদি—'

জয়া হার খুলতে যাচ্ছিল, মোহিনী এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'নো-নো, কিছুতেই না ওগুলো আমি তোমাকে অ্যাডভান্স প্রেজেন্টেশান দিলাম অ্যাট লিস্ট প্রেজেন্টেশানের জন্যেও যদি তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেল।'

বিজয়রা চলে গেল।

জয়া আর অজয় অন্য গাড়িটায় উঠতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিল। একটু পর ওরা মেরিন ড্রাইভে এসে পড়ল। তেলের মতো মসৃন রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটা আরো কিছুক্ষণ পর মেরিন লাইনসের ফ্লাই ওভারের তলা দিয়ে মালাবার হিলস বাঁয়ে রেখে, কামবালা হিল পেছনে ফেলে, পেডার রোডে চলে এল। হাই-রাইজ বিল্ডিংগুলোর মাথায় লাল নীল নিওন সাইনে নানা কোম্পানির বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন জ্বলছে, নিভছে। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে কর্পোরেশনের উজ্জল মার্কারি আলোগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে।

অনেকক্ষণ দু জনেই চুপচাপ। এক সময় হঠাৎ অজয় বলল 'আমি কিন্তু একটা এক্সপেক্টেশন নিয়ে তোমার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছি।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল জয়া। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আবছা গলায় বলল, 'কী?,

'আজ আমাকে বলবে—কেন বিয়েটা করতে পারছ না?'

কাল বাড়ি ফেরার পর থেকে আজ অফিসে আসা পর্যন্ত জয়া ঠিকই করে রেখেছিল অজয়কে এ ব্যাপারে সব বলবে। কিন্তু আসার কিছুক্ষণ বাদেই এলেন কার্নাল সিং আর চন্দ্রা। তারপর এমন সব উল্টোপাল্টা নাটুকে কাণ্ড কারখানা ঘটে গেল যাতে কথাটা আর মনে ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না জয়া। কয়েক পলক চুপ করে থেকে বলল, 'সব বলব। তোমাকে না বললে আমি কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।'

অজয় জয়ার দিকে এগিয়ে এল এবং প্রায় দম বন্ধ করেই যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

জয়া তার বাবার পারিবারিক ইতিহাস থেকে শুরু করে বিজলীর কাছে থাকা, গান শেখা, নাম করা, বোম্বাইতে আসা, চন্দ্রার সঙ্গে বিয়ে, নিজের জন্ম, সাধনার কথা, চন্দ্রার সঙ্গে ডাইভোর্স, কার্নাল সিং-এর সঙ্গে চন্দ্রার দ্বিতীয় বিয়ে—সব বলে গেল। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। সে আরো জানালো, উইক-এণ্ডে সাধনা দু-দিনের জন্য আসে ঠিকই, নইলে গত চব্বিশ পঁচিশ বছর বাবা আর সে একসঙ্গে একই সুখ-দুঃখের ভেতর কাটিয়ে দিয়েছে। সাধনাকে বাদ দিলে পরস্পরের সঙ্গী বলতে, বন্ধু বলতে তারা নিজেরা ছাড়া আর কেউ নেই। এত বছর এক সঙ্গে থেকে থেকে তারা কখন যে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল, আগে টের পাওয়া যায় নি। বোঝা গেল বিয়ে করতে এসে। পঁচিশ বছরের একটানা কমপেনিয়নশিপ যতবার ছিঁড়তে গেছে ততবারই নানা ঘটনা এবং দুঃখের টুকরো টুকরো স্মৃতির কোলাজ দিয়ে তৈরি বাবার বিরাট একটা পোরট্রেট সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটাকে ঠেলে সরিয়ে অজয়ের কাছে যাওয়ার মতো শক্তি তার নেই।

সব বলার পর দু-হাতে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে, খুব নিঃশব্দে

ফোঁপাতে লাগল জয়া। অজয় গভীর যত্নে এবং সহানুভূতিতে তার কাঁধে একখানা হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল, 'কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জয়া বালিকার মতো কাঁদতেই লাগল। অজয় বাধা দিল না; জয়াকে নিজের দিকে আরেকটু নিবিড় করে টেনে আনল শুধু।

অনেকক্ষণ পর কান্নাটা থেমে এলে ভাঙা ভারী গলায় জয়া বলল, 'কী করে সব ঠিক হয়ে যাবে বুঝতে পারছি না। আমি যে বড় দুর্বল।'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

জয়া চুপ করে রইল।

বার

এক সময় অজয়ের গাড়িটা জুহুতে জয়াদের হাই-রাইজ বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়িটাকে কম্পাউণ্ডের ভেতর নিয়ে যাওয়া যেত। ইচ্ছা করেই অজয় নিল না।

আগে দু-একবার অজয় জয়াকে এই রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে কিন্তু কখনও তাদের ফ্ল্যাটে যায় নি। অবশ্য মজা করবার জন্য শিবনাথের সঙ্গে দেখা করার কথা বলত সে। ভয়ে জয়ার গায়ে কাঁটা দিত; কিছুতেই সে অজয়কে বাবার কাছে নিয়ে যেত না।

অজয় বাঁ দিকের জানালার ধার ঘেঁষে বসে ছিল। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে জয়ার বেরুবার জায়গা করে দিল। জয়া নামলে দু হাতের তালু উল্টে দিয়ে অজয় বলল, 'বিয়ের পর সবাই বউ নিয়ে বাড়ি ফেরে। আমি প্রেজেণ্টেশানের বাক্স নিয়ে যাচ্ছি।'

জয়ার মুখটা হঠাৎ ভারি করুণ হয়ে গেল।

অজয় তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, 'প্লীজ ওটা একটা জোক। কিছু মনে করো না।'

জয়া উত্তর দিল না।

অজয় বলল, 'যাও, বাড়ি চলে যাও। কাল দেখা হবে।'

অজয় চলে গেল। কিছুক্ষণ পর লিফটে করে ইলেভেনথ ফ্লোরে এসে দরজার বেল টিপতেই শিবনাথ দরজা খুলে দিলেন। তারপর জয়ার দামী পোশাক এবং জড়োয়া গয়নার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল যেন।

জয়ার বুকের ভেতরটা ঢেউয়েব মতো দুলছিল।

শিবনাথ বললেন, 'এ সব শাড়ি-গয়না তুই কোথায় পেলি?' তাঁর গলা অনেক দূর থেকে হাওয়ার ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এল যেন।

জয়া আর দাঁড়াতে পারছিল না। কোনরকমে ঝাপসা গলায় বলল, 'আমার যে বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম সে-ই দিয়েছে। ও খুব সেজে বেরিয়েছিল; আমাকে কিছুতেই অফিসের শাড়ি জামা পরে যেতে দিল না। অনেক রাত হয়ে গেছে বলে আজ এগুলো ফেরৎ দিতে পারিনি; কাল দিয়ে আসব।' বলতে বলতে তার মনে পড়ে গেল আজও বাবার কাছে মিথ্য বলতে হচ্ছে। ক্রমশঃ একটা ফাঁসের ভেতর সে যেন আটকে যাচ্ছে। জয়ার আরো একটা কথা মনে পড়ল এইসব দামী দামী গয়না আর শাড়ি বিয়ের আগেই তাকে উপহার দিয়েছে মোহিনী। কিন্তু আপাততঃ এগুলো বাড়িতে রাখা যাবে না; কাল অজয়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ফ্ল্যাটে রেখে আসবে।

শিবনাথ বললেন, 'তোর এই বন্ধু আন্ধেরিতে থাকে না?'

জয়া কাল বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে নেমন্তন্নের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিল ওরা আন্ধেরিতে থাকে। বাবা আন্ধেরির কথা মনে করে রাখবেন, সে ভাবতে পারি নি। আস্তে করে সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় সিনেমা দেখলি তোরা?'

'এরোস হলে।'

কথাবার্তার মধ্যে কিচেন থেকে বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার শব্দ আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল, ঘাটকোপারে ছুটি কাটিয়ে তারা ফিরে এসেছে। শিবনাথ বললেন, 'সে তো প্রপার বম্বেতে।'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

'তোর বন্ধু নিশ্চয়ই তোর সাজার জন্যে শাড়ি-গয়না নিয়ে তোব অফিসে যায় নি।'

বাবা ঠিক কী বলতে চান, জয়া বুঝতে পারছিল না। সে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে?'

'তা হলে কী?'

'প্রপার বম্বে থেকে আন্ধেরিতে এসে জামাকাপড় বদলে সিনেমা দেখার জন্যে আবার প্রপার বম্বেতে গেলি!'

বাবার কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। সেটা বুঝতে পারছিল জয়া। তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে বালির মতো খরখরে হয়ে যাচ্ছিল। কাঁপা গলায় সে জানালো, বন্ধুর স্বামীর গাড়ী আছে। গাড়িতে করে বম্বে থেকে আন্ধেরি হয়ে আবার বম্বেতে ফিরতে কতক্ষণ আর লাগে।

শিবনাথ অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'দু দিন ধরে তুই খুব সাজছিস!'

জয়া উত্তর দিল না। মুখটা নিচের দিকে আরেকটু নুয়ে পড়ল।

শিবনাথ এবার বললেন, 'খেয়ে এসেছিস তো?'

'হ্যাঁ। তুমি খেয়ে নিয়েছ?'

'নিয়েছি।'

'ওষুধ খেয়েছ?'

'খেয়েছি।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ রে—'

জয়া আর দাঁড়ালো না। আসলে শিবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, বাবার কাছে সব ধরা পড়ে যাচ্ছে। জয়া বলল, 'ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—' বলেই বাবার পাশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অন্যদিন শিবনাথকে নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে তাঁকে বিছানায় পাঠিয়ে, গায়ে পাতলা চাদর টেনে দিয়ে, বেশি পাওয়ারের লাইট নিভিয়ে জিরো পাওয়ার আলোটি জ্বেলে তবে শুতে যায় জয়া। আজ মোহিনীর দেওয়া শাড়ি-গয়না বদলে একটা হাউসকোট পরে সারা গা এবং মুখ-মাথা চাদরে ঢেকে দু-মিনিটের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে তারা এল। রাত্তিরে এ-ঘরের মেঝেতে ঘুমোয় সে। তার শতরঞ্চি-জড়ানো বিছানাটা থাকে সাধনার 'কটে'র তলায়. আর থাকে তার একটা ক্যানভাসের বড় স্যুটকেস।

বিছানাটি পেতে স্যুটকেস থেকে স্নো-পাউডার আয়না-চিরুনি বার করল তারা। সারা দিনে সময় পায় না। রাত্তিরে সব কাজ-কর্ম চুকিয়ে বিছানায় বসে মাথায় সুন্দর গন্ধওলা তেলটি মেখে পরি-পাটি করে চুল আঁচড়ায় তারা; সারা গায়ে খুব যত্ন করে সেন্টপাউডার ঢালে। তারপর নানারকম মশলা দিয়ে একটি পান সেজে মুখে পুরে ঘুমোয়।

আজও চুলবাঁধা, পাউডার মাখা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিখুঁত-ভাবে শেষ করে আয়না-চিরুনি সেন্টের শিশি-টিশি স্যুটকেসে পুরে আলো নিভিয়ে মশলাদার পানটি চিবুতে চিবুতে শুয়ে পড়ল তারা। ঘরে একটুও আলো থাকলে জয়ার ঘুমোতে অসুবিধা হয়। তাই জিরো পাওয়ারের বাল্বও এখানে জ্বালানো হয় না।

চাদর ঢাকা দিয়ে থাকলেও জয়া সব টের পাচ্ছিল। হঠাৎ এ পাশে ফিরে তারা ডাকল, 'দিদি --'

জয়া জানতো তারা তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা-টথা না বলে ঘুমোবে না। ঘাটকোপারে ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে কী করেছে, কী খেয়েছে, কোথায় বেড়িয়েছে, কে কী বলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় খবর না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। কথাগুলো এখন তার পেটের ভেতর সোডার মতো ফেনাচ্ছে। শুধু তাই না, এই দু দিন জয়ারা কে কী করেছে, এই কুড়িতলা অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের কোন ফ্ল্যাটে কী ঘটেছে, তা-ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। একবার বকর বকর শুরু করলে তারা থামতে জানে না; লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মতো বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে। তার ওপর যদি সে ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে থাকে জয়া দুদিন রাত করে দারুণ সেজে-টেজে ফিরেছে, তা হলে আজ আর ঘুমোবার কোন আশাই নেই। সারারাত কত রকম কৈফিয়ৎ যে দিতে হবে! কাজেই জয়া উত্তর দিল না।

তারা আরও বার কয়েক ডাকাডাকি করল। জয়ার দিক থেকে

কোন রকম সাড়া নেই। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে সে বোঝাতে চাইল, ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারা কিছুটা বিরক্ত গলায় বলল, 'আজ তোমার কী হয়েছে গো! বাবার ঘরে গেলে না, আমার সঙ্গে দেখা হল না। ঘরে এসে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লে! এমনটা তো তুমি কখনও করো না।'

জয়ার নিশ্বাসের শব্দ আরো ভারী, আরো গাঢ় হতে লাগল।

অনেক রাত্তিরে গোটা অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটা যখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে, দুধের মতো ধবধবে জ্যোৎস্নায় জুহুর বাদামী বালির বেলাভূমি অলৌকিক হয়ে উঠেছে, বাতাস কিংবা সমুদ্রের শব্দ ছাড়া যখন আর কোথাও কোন শব্দ নেই সেই সময় পাশের ঘর থেকে কোমল নিখাদে ভায়োলিনের সেই বিষণ্ণ সুর ভেসে এল।

প্রথমে আবছাভাবে সুরটা কানে এসেছিল। তার পরেই ঝট করে ঘুমটা ভেঙে গেল জয়ার। সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল বুকের গভীর থেকে অদৃশ্য এক যন্ত্রণা ছুঁচের মুখের মতো সমস্ত অনুভূতিকে বিঁধে চলেছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসল জয়া। চোখে পড়ল, নিচে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে তারা।

পাশের ঘরে সেই সুরটা ক্রমশঃ কোমল নিখাদ থেকে সমস্ত চরাচরের অপার্থিব একটা কষ্ট ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশঃ চড়ায় উঠে আসছিল।

জয়া আর বসে থাকতে পারছিল না। এলোমেলো পা ফেলে তারার বিছানার পাশ দিয়ে পাশের ঘরে চলে এল জয়া

শিবনাথ জ্যোৎস্না-ধোয়া বীচের দিকে ফিরে বুকের ভেতর ভায়োলিন আটকে ছড় টেনে যাচ্ছিলেন। স্পষ্ট তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না; একটা সিলুয়েট ছবির মতো মনে হচ্ছিল।

জয়া নিশির ডাকের মতো কোন এক অলৌকিক টানে পায়ে পায়ে শিবনাথের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের অজান্তেই কখন যেন ডেকে উঠল, 'বাবা—'

শিবনাথ বোধ হয় জানতেন জয়া আসবেই। বাজনা থামিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন।

জয়া আবার বলল, 'বাবা '

শিবনাথ অনেকখানি ঝুঁকে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'তুই কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবি জয়া ?'

আচমকা শিবনাথের বুকের ভেতর মুখ গুঁজে বালিকার মতো ফুঁপিয়ে উঠল জয়া, আর সমানে বলে যেতে লাগল, 'বাবা, বাবা, বাবা—'

শিবনাথ তার মাথায় কোমল আঙুল বুলিয়ে যেতে লাগলেন। পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে এল জয়া। তার ঠিক পঁচিশ মিনিট বাদে এল অজয়ের ফোন।

অজয় যে ফোন করবে এটা জানাই। রোজই করে। এমনিতেই খুব জরুরি কোন ব্যাপার না থাকলে টিফিনের আগে অজয়ের ফোন আসে না। আজ হঠাৎ কী এমন হল, জয়া বুঝতে পারল না। কিছুটা উদ্বিগ্নের মতোই রিসিভারটা কানের কাছে ধরে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওধার থেকে হইচই বাধিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অজয় বলল, 'অল প্রবলেমস সলভড। কাল হোল নাইট একটুও না ঘুমিয়ে সলিউসানটা বার করে ফেলেছি। আই অ্যাম হ্যাপি প্রিন্স নাউ—, টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে তার খুশি আর উচ্ছ্বাস ঢেউয়ের মতো তোড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

জয়া কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'কিসের প্রবলেম, কিসের সলিউসান ?'

অজয় বলল, 'তোমার আর আমার বিয়ের।' একটু থেমে রগড়ের গলায় এবার বলল. 'কোন ইণ্টারন্যাশনাল প্রবলেমই এত কমপ্লিকেটেড নয়। যাক গে, আর কোন চিন্তা নেই।'

অজয় যা ছেলে, তাকে একেবারেই বিশ্বাস নেই। ঝোঁকের মাথায় সে কী ঠিক করে ফেলেছে, কে জানে। কাল রাত্তিরে সব পারিবারিক কথা বলে ফেলা উচিত হয়েছে কিনা, জয়া এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না। সে বেশ ভয়ে ভয়েই বলল, 'কী সলিউসান ঠিক করেছ ?'

অজয় বলল, 'তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও।'

'কী ?'

'তুমি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে এসে শেষ পর্যন্ত সইটা করতে পারছ না কেন ? ট্রাবলটা কোথায় ?'

জয়া নার্ভাস বোধ করল। দুর্বল গলায় বলল, 'মানে—'

অজয় বলল, 'আমি জানি বাধাটা কোথায় ?'

'কোথায় ?' জয়া শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করল।

'বাধাটা হল তোমার বাবা। ঠিক বাবা না—' বলতে বলতে থেমে গেল অজয়।

জয়ার নিজের অজান্তেই বলে উঠল, 'তা হলে কী ?'

'তোমার ভেতরকার একটা কমপ্লেক্স—'

'কিসের কমপ্লেক্স ?,

'সেটা তুমি নিজেই জানো।'

জয়া তা জানে। বাবাকে ঘিরেই সেই কমপ্লেক্সটা জট পাকিয়ে আছে। সে চুপ করে রইল।

অজয় ওপার থেকে উচ্ছ্বাসের গলায় আবার বলে উঠল, 'আমি যা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি তোমার ঐ কমপ্লেক্সটা আর থাকবে না। আগে যদি তোমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা বলতে কবে এই জট ছাড়িয়ে ফেলতাম। তিন বছর ধরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে ডিফিটিস্টদের মতো ফিরে আসতাম না। যাক, বেটার লেট ছ্যান নেভার।'

অজয়ের শেষ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল না জয়া। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উৎকণ্ঠা তাকে অস্থির করে তুলছিল। সে বলল, 'কী সলিউসান বার করেছে, তা বলছ না তো।'

'সেটা এখন না। ছুটির পর ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের মেইন গেটের সামনে দাঁড়িও; তখন বলব। ততক্ষণ কিউরিওসিটিটা থাক।' বলেই ঝট করে লাইনটা কেটে দিল অজয়।

জয়ার ভীষণ রাগ হচ্ছিল ভাবল, এখনই অজয়কে ফোন করে জোরজার করে সলিউসানটা জেনে নেয়। কি ভেবে করল না।

ছুটির পর ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অজয় একটা ট্যাক্সি করে এসে হাজির। জয়াকে তুলে

নিয়ে সে চলে গেল চৌপাট্টি বীচে। এই জায়গাটা তার খুব পছন্দ। ছুটির পর জয়াকে নিয়ে প্রায়ই এখানে চলে আসে সে।

জলের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি বসে অজয় বলল, 'মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার ওপর ভীষণ রেগে আছ! আর ঝুলিয়ে রাখব না। সলিউসানটা হল আমাদের বিয়ের আগে আরেকটা বিয়ের ব্যবস্থা করা।'

জয়া চমকে উঠল, 'কার বিয়ে?'

অজয় হাতজোড় করে কাচুমাচু মুখে বলল, 'আমার ফাদার-ইন-ল'য়ের মানে তোমার বাবার।,

'বাবার বিয়ে! কার সঙ্গে?'

'একেবারে ব্লাইণ্ড তুমি। তোমার সাধনা মাসী এত বছর ধরে কেন প্রত্যেক উইক-এণ্ডে চান্দেলি থেকে বম্বে আসছেন সেটা ভেবে দেখেছ?'

সাধনা মাসী আর বাবা পরস্পরকে যে ভালবাসেন, জয়া তা জানে। কিন্তু তাঁদের বিয়ের কথা কখনও সে ভাবে নি। অথচ এই বিয়েটাই সব চাইতে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অজয় না বললে কোনদিন এটা তার চোখেও পড়ত না।

অজয় আবার বলল, 'তোমার বাবা যতক্ষণ না একজন কম্পেনিয়ান পাচ্ছেন তোমার পক্ষে আমাকে বিয়ে করা সম্ভব না। কী, কথাটা সত্যি তো?'

জয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এই বয়সে ওদের বিয়ে!'

জয়া কী বলতে চায়, অজয় বুঝতে পারছিল। সে বলল, 'সেক্সের জন্যে বিয়েটা হবে না। বিয়েটা দরকার শেষ বয়সের একজন সঙ্গীর জন্যে। জাস্ট কম্পেনিয়ানশিপ।'

জয়ার মনে হল, অজয়ের কথাই ঠিক। তবে, সেই সঙ্গে আরেকটা দিকও ভাববার আছে। সে বলল, 'ওঁরা তিরিশ বছরের ওপর একজন

আরেক জনকে চেনেন কিন্তু আমার ধারণা কেউ কাউকে কোনদিন বিয়ের কথা বলেন নি। বললে আমি অন্তত জানতে পারতাম। বাবা আমার কাছে কোন কথা লুকোন না। এখন, এতদিন পর বিয়েটা হবে কি করে?'

'ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বেঞ্জামিন আঙ্কেলের সঙ্গে আজ সকালে পরামর্শ করে একটা রাস্তা বার করেছি। আই থিঙ্ক আই উড কাম আউট সাকসেসফুল।'

'কী ব্যবস্থা করেছ? শেষে আমাকে একটা বিচ্ছিরি অবস্থায় ফেলতে চাও!'

'কিচ্ছু ভয় নেই। কোন কোন সময় ড্রাস্টিক স্টেপ নিতে হয়। ইউ নীড নট ওরি। কিন্তু সবার আগে এখন যেটা দরকার তা হল তোমার সাধনা মাসীর সঙ্গে দেখা করা। কি ভাবে দেখাটা হতে পারে বল তো?'

'তাঁকে কী দরকার?'

'তিনিই তো আসল লোক; তাঁকে ধরতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জয়ার কাছে সব ব্যাপারটা জট পাকানো ধাঁধার মতো মনে হচ্ছিল। সে বলল, 'সাধনা মাসী এই উইক-এণ্ডে বম্বে আসছেন না। পরের সপ্তাহে এলে দেখা করিয়ে দেব। কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করছে।'

জয়ার নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে অজয় বলল, 'দূর বোকা মেয়ে, ভয়ের কী! কনেকে জপিয়ে জাপিয়ে রাজী করিয়ে ফেলতে পারলে বরকে সে-ই কাৎ করে ফেলবে। তখন আমাদের ঝামেলা 'নিল' হয়ে গেল।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হলো?'

,সাধনা মাসী কি রাজী হবেন?,

'খবর নিয়ে দেখো ম্যারেজ ফর্মে সই দেবার জন্যে পঁচিশ বছর ধরে

উনি কলমে কালি পুরে বসে আছেন।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে!'

'গুরুজনদের নিয়ে কেউ ইয়ার্কি করে। তবে এটা ফ্যাক্ট। যাক গে এসব। সাধনা মাসী যখন এই উইকে আসছেন না, তুমি আর আমি চান্দেলি যাব।'

'এত তাড়া কিসের? নেক্সট উইকেট তো আসছেই।'

'অনেক ওয়েট করেছি; আর না। রবিবার সকালে আমরা চান্দেলি যাচ্ছি। সন্ধেবেলা ফিরে আসব। অফিস থেকে একটা গাড়ি নিয়ে নেব। কোন অসুবিধা হবে না। তুমি সাধনা মাসীর কোয়ার্টারে আগে গিয়েছ তো?'

'গিয়েছি। কেন?'

'চেনা জায়গা হলে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।'

আরো কিছুক্ষণ পর আরব সাগরের জলে টকটকে লাল রঙ-গুলো দিয়ে সূর্য ডুবে গেল। ঝিঁঝি অন্ধকারে চারদিক যখন ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল সেই সময় জয়া বলল, 'এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

'চল—,

অজয় আর জয়া উঠে পড়ল।

আরো খানিকক্ষণ বাদে চার্চগেট স্টেশনে জয়াকে ট্রেনে তুলে দিল অজয়। জয়া জানালার ধারে একটা সীট পেয়েছিল। বাইরে প্ল্যাটফর্মে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অজয় বলল, 'মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে আগে যে তার বাবার বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে ভাবতে পারি নি।'

জয়া বলল, 'আবার ইয়ার্কি!'

হাতজোড় করে রগড়ের ভঙ্গিতে অজয় বলল, 'ক্ষমা—ক্ষমা –'

রাগ করতে গিয়ে জয়া হেসে ফেলল।

একটু পর ট্রেন ছেড়ে দিল।

তেরো

আগের থেকেই ঠিক ছিল রবিবার সকালে সান্তাক্রুজ স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে জয়া। অজয় এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

শনিবার রাত্তিরে শিবনাথকে চান্দেলি যাবার কথা বলেছে জয়া। শিবনাথ কিছুটা অবাক হলেও আপত্তি করেন নি। ভেবেছেন এ সপ্তাহে সাধনা আসবে না বলে হয়তো জয়ার ভালো লাগছে না; তাই চান্দেলি যেতে চাইছে।

কথামতো সকালে সান্তাক্রুজ স্টেশনে চলে এল জয়া। অজয় তাকে নিয়ে বম্বে-পুণা হাইওয়ে ধরে সাড়ে দশটার মধ্যে চান্দেলি পৌঁছে গেল।

বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কম্পাউণ্ডের এক ধারে সাধনার সুন্দর একতলা কোয়ার্টার। সামনের দিকে বাগান; এই মরসুমে নানা রঙের ফুলে ফুলে বাগানটা ছয়লাপ।

সাধনা কোয়ার্টারেই ছিলেন। জয়া যে এভাবে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে হুম করে চলে আসবে, সেটা তিনি ভাবতে পারেন নি। জয়াকে দেখে সাধনা দারুণ খুশী হলেন, আর অজয়কে দেখে অবাক। বললেন, 'এই ছেলেটি?'

জয়া লাজুক হেসে নতমুখে বলল, 'তুমি একটা কথা জানতে চেয়েছিলে। তাই ওকে নিয়ে এলাম। ওর নাম অজয়।'

সাধনা স্থির চোখে একবার অজয়কে দেখলেন, একবার জয়াকে। তারপর স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'বুঝেছি।'

ততক্ষণে অজয় সাধনাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে মাসীমা।'

'এখন না; দুপুরে খেতে বসে।'

জয়া আর অজয়ের আদর-যত্ন এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুবই ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন সাধনা। কোয়ার্টারে দুটি কাজের লোক আছে

তাঁর। একজন মধ্যবয়সী মারাঠী বাঈ, আরেকজন কমবয়সের ছোকরা—সেও মারাঠী। ছোকরা চাকরটিকে তখনই বাজারে পাঠালেন সাধনা আর বাঈকে সঙ্গে নিয়ে নিজে রান্নাঘরে ঢুকলেন। জয়া তাঁর কাছে গিয়ে বসল। অজয় রান্নাঘরের সামনে একটা চেয়ারে বসে সাধনার অনুমতি নিয়ে সিগারেট খেতে খেতে এলোমেলো নানারকম গল্প করে যেতে লাগল।

দু'ঘণ্টা পর তিনজনে মুখোমুখি খেতে বসল ওরা। টেবলের এক পাশে বসেছেন সাধনা আর জয়া, উল্টোদিকে অজয়। ডাইনিং স্পেসের একধারে বাঈ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো পাতের ভাত, মাছ বা মাংস শেষ হলেই কিচেন থেকে পরবর্তী আইটেম নিয়ে আসবে

সাধনা বললেন, 'এবার তোমাদের কথা বল—'

জয়ার সঙ্গে তিন চার বছর আগে তার আলাপ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি সব কিছু বলে গেল অজয়। এমন কি তিন তিন বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে কিভাবে মুখ চুন করে আসতে হয়েছে সেটাও বাদ দিল না।

সাধনা চোখের কোণ দিয়ে জয়াকে দেখতে দেখতে হাল্কা গলায় বললেন, 'কি চাপা মেয়ে রে তুই! এতদিন ধরে এই সব কাণ্ড করে যাচ্ছিস অথচ আমাকে কিছুই জানাস নি।'

মুখ নামিয়ে আঙুল দিয়ে প্লেটের ওপর আঁকিবুকি কাটতে লাগল জয়া। কোন উত্তর দিল না।

অজয় এবার বলল, 'আপনাকে সব কথা বললাম। এবার আপনি আমাদের এই বিয়ের ব্যাপারে হেল্প করুন. আমিও আপনাকে সাহায্য করব। ইউ ডু সামথিং ফর আস, আই ডু সামথিং ফর ইউ। এটা পারস্পরিক।'

'প্রথমে একটা কথার উত্তর দাও। আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করব?'

'দেখুন, আমার ধারণা জয়া ওর বাবার সম্বন্ধে কোনরকম একটা কমপ্লেক্সে ভুগছে।'

'কী কমপ্লেক্স ?'

'বহুদিন ও ওর বাবার সঙ্গে আছে। এই থাকাটা একটা হ্যাবিটের মতো হয়ে গেছে। ওরা কেউ যদি কাউকে ছেড়ে যায় দু'জনের পক্ষেই বিরাট ভ্যাকুয়াম হয়ে দাঁড়াবে। আশার সঙ্গে বিয়ে হলে জয়ার ভ্যাকুয়াম আমি অনেকটা ফিল-আপ করে দিতে পারব। কিন্তু ওর বাবার পাশে যে ভ্যাকুয়াম হবে সেটা ফিল-আপ করার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আপনি যদি পারমিশান দেন একটা কথা বলব ?'

সাধনা মুখ তুলে তাকালেন।

অজয় বলতে লাগল, 'আপনি জয়ার বাবার দায়িত্বটা পার্মানেণ্টলি নিয়ে নিন। আপনি কাছে থাকলে জয়ার অ্যাবসেন্সটা উনি অনেকখানি সইতে পারবেন।'

সাধনা হকচকিয়ে গেলেন, কী বলছ তুমি !'

'মাসীমা, আপনি নিজের দিকে তাকিয়ে বলুন তো, যা আমি বললাম সেটা আপনি কোনদিন চান নি ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সাধনা অন্যমনস্কর মতো আধফোটা গলায় বললেন, 'চেয়েছি। বার বার চেয়েছি '

'সেইজন্যেই পঁচিশ তিরিস বছর ধরে উইক-এণ্ডে বম্বে চলে যাচ্ছেন।'

ঘোরের মধ্যে থেকে সাধনা বলে উঠলেন, 'যাচ্ছি। কিন্তু—'

'কী ?'

'কেন কাউকে আমরা কিছু বলি নি। সংসারের সব দায়িত্ব শেষ করার পর যখন বলার ইচ্ছা হল, দেখলাম বয়স চলে গেছে। তারপর একটা অভ্যাসের মতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চান্দেলি থেকে বম্বে ছুটছি।'

গভীর সহানুভূতির গলায় অজয় বলল, 'বয়স হয়তো গেছে কিন্তু মনটা তো আছে। সেটা থাকলেই হলো। আপনি রাজী হয়ে যান ; বাদ বাকী ব্যবস্থা আমি করব। অবশ্য শেষ সময়ে যদি দরকার হয় আপনাকে একটু জোর খাটাতে হবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

অজয় জানালো, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বেঞ্জামিন সাহেবের সঙ্গে এ

বিষয়ে সে পরামর্শ করে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে সাধনা আর শিবনাথের নামে অজয়রা বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে একটা বিয়ের নোটিশ দেবে। সাধনা তাতে সই করবেন. আর শিবনাথের নামে নকল সই করবে অজয়। বিয়ের একটা ডেট স্থির করে সাধনা এবং শিবনাথ, ত্ব'জনকেই জানিয়ে দেবেন বেঞ্জামিন সাহেব। তিনিই তিনজন বয়স্ক সাক্ষী যোগাড় করবেন। নির্দিষ্ট তারিখে সাধনা বেঞ্জামিন সাহেবের অফিসে যাবেন। আচমকা বিয়ের নোটিশ পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন শিবনাথ কিন্তু কনের নামটা দেখে কৌতূহলের বশে শেষ পর্যন্ত বেঞ্জামিন সাহেবের কাছে না গিয়ে পারবেন না। সেখানে শিবনাথ যদি কোন গোলমাল করেন সাধনাকে একটু জোর খাটাতে হবে। পুরুষের ওপর কি করে জোর খাটাতে হয় সেটা নিশ্চয়ই সাধনাকে শিখিয়ে দেবার দরকার নেই। হিউম্যান সাইকোলজি অজয় যেটুকু জানে তাতে শিবনাথ কোন রকম আপত্তি করবেন না বলেই তার ধারণা।

সব শুনে সাধনা লাজুক হাসলেন। আস্তে করে বললেন, 'নটি বয়।,

বোঝা গেল, এ বিয়েতে ত াঁর কোন আপত্তি নেই। অজয় বলল, 'এবার আমাদের কথা বলি। আপনাদের ব্যাপারটা হয়ে গেলে জয়ার বাবার কাছে আমাদের ব্রিফ নিয়ে আপনাকেই কিন্তু দাঁড়াতে হবে।'

সাধনা হাসলেন।

চোদ্দ

কয়েক দিন পর অজয়ের ছক অনুযায়ী সাধনা আর শিবনাথের বিয়েটা হয়ে গেল। শিবনাথ বেঞ্জামিন সাহেবের অফিসে গিয়ে কোন রকম আপত্তি করেন নি; তবে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার যখন এই ইচ্ছা ছিল, আগে বল নি কেন?'

সাধনা অজয়ের পরিকল্পনা গোপন রেখেই বলেছিলেন, 'এ সব কথা পুরুষদের আগে বলা নিয়ম। কিন্তু তুমি নিয়মের বাইরের মানুষ। তাই এতগুলো বছর ওভাবে কেটে গেল।'

'শেষ পর্যন্ত আর না পেরে আমার সই নকল করে নোটিশ দিলে বুঝি ?'

'কী করব।'

বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জুহুতে চলে এলেন সাধনা। আরো তিন চার বছর তিনি কাজ করতে পারতেন। সেই যৌবনের গোড়া থেকে সংসার বাঁচাবার জন্য চাকরিই করে গেছেন। জীবনের লম্বা দৌড় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খুবই ক্লান্ত তিনি; এখন তাঁর প্রয়োজন অগাধ বিশ্রাম। তাছাড়া এখন নিজস্ব সংসার হয়েছে। এটাও তো একটা হোল-টাইম ডিউটি।

চাকরি ছাড়ার পর অফিস থেকে গ্র্যাচুয়িটি আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড মিলিয়ে লাখদেড়েক টাকা পেয়েছেন। সেটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে। সেখান থেকে যে ইণ্টারেস্ট পাওয়া যাবে আর মিউজিক হ্যাণ্ড হিসেবে শিবনাথের যা আয়, সব মিলিয়ে দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

পনের

শিবনাথ এবং সাধনার বিয়ের এক মাস পর জয়া আর অজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বেঞ্জামিন সাহেবই ছিলেন এ বিয়ের পুরুত। স্টেট গভর্নমেণ্টের এমপ্লয়ীদের হোস্টেলে গিয়ে অজয় মধু, নবীন, অমল আর রমেশকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে এনেছিল।

সই-সাবুদ হয়ে যাবার পর বেঞ্জামিন সাহেব আশীর্বাদ করলেন, 'গড ব্লেস ইউ। তোমারা সুখী হও।' একটু থেমে মজা করে বললেন, 'অ্যাট লাস্ট ইউ হ্যাভ রীচড জার্নিস এণ্ড।'

বিয়ের পরের দিন জুহুর একটা হোটেলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করলেন শিবনাথ। জয়া তার অফিসের কর্মীদের নেমন্তন্ন করেছিল। শিবনাথ নেমন্তন্ন করেছিলেন অজয়ের আত্মীয়স্বজন এবং নিজের ট্রেডের

বন্ধু-বান্ধবদের। এ ছাড়া বিয়ের উইটনেস ওই চারজন—মধু, অমল-টমলদের ডাকা হয়েছিল।

উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো ব্যাঙ্কোয়েট হলে ছোটাছুটি করে সাধনা অতিথিদের আপ্যায়ন করেছিলেন। সবার খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখছিলেন।

চারদিকে সুসজ্জিত পুরুষ এবং মহিলার ভিড়। টুকরো টুকরো হাসি, 'জোক', ঠাট্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভিড়ের মাঝখানে থেকেও বার বার জয়ার চোখ গিয়ে পড়ছিল শিবনাথের ওপর। একধারে অপরিচিতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে পলকহীন জয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। গাঢ় গভীর এক বিষাদ তাঁকে ঘিরে ছিল।

আজ এই পার্টির পর জয়া অজয়ের সঙ্গে চলে যাবে। বাবাকে দেখতে বার বার তার মনে হতে লাগলো, যে শূন্যতা বাবার কাছে সে রেখে যাচ্ছে কিংবা যে শূন্যতা সে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে তার খুব সামান্যই সাধনা বা অজয় পূরণ করতে পারবে।

এক সময় পার্টি শেষ হল। জয়া আর অজয় শিবনাথ এবং সাধনাকে প্রণাম করে বলল, 'আমরা যাই।'

সাধনা বললেন, 'এসো।'

শিবনাথ জয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু বলতে চাইলেন; ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কাঁপল শুধু।

কিছুক্ষণ পর গাড়িতে করে অজয়ের পাশে বসে কোলাবার দিকে যেতে যেতে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল জয়া। রাস্তার আলো ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট কারের স্রোত, দু'ধারে ছিমছাম বাড়ি, দোকান, শো-উইণ্ডো, কিছুই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল না। মধ্যরাতে কিংবা নিঝুম দুপুরে কোন দুঃখের মুহূর্তে শিবনাথ কোমল নিখাদে ভায়োলিনে যে সুরটা বাজান এখন সেটাই কোথায় যেন বেজে যাচ্ছে। নিজের বুকের গভীরেই কী? জয়া বুঝতে পারল না। শুধু চোখ দুটো জলে ভরে যেতে লাগল।

সমাপ্ত